KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজপত্র (Sabuj Patra)	Size : 7·5" x 6"
Vol. & Number : 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5	Year of Publication : বৈশাখ ১৩২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ শ্রাবণ ১৩২৫ আশ্বিন ১৩২৫ পৌষ ১৩২৫
	Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।
সবুজ পত্র-কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইকলী নোটস্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গীয় সাময়িক পত্র পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র
স্থাপিত ১৯৭৮

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

(বৈশাখ—আশ্বিন)

১৩২৫ সন।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
Indian Literature	Pramatha Chaudhuri	১৮৯
একটি সত্যি গল্প (গল্প)	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৯৯
"এত্তো বড়" কিম্বা "কিছু নয়"	বীরবল	২৫৪
কালো মেয়ে (কবিতা)	স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬২
গুরু	শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার	৩১
ছিন্ন পত্র (কবিতা)	স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২২
ছোট কালীবাবু (তেপাটি, কবিতা)	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	২৬০
ছোট গল্প (গল্প)	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	২৩৪
হু-হু-বার (গল্প)	শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী	১৫০
দেশের কথা	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	৫৮
নব-বিদ্যালয়	ঐ ঐ	১৮, ১৩৩, ৩৮০
নব-বর্ষ	শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী	৪০
নবীন সাহিত্যিক	শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত	৯৮
পত্র	বীরবল	৪৪, ১০৩, ২৬৩, ৩৩৭
পয়ার	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	২৮৭
প্র্যাক্‌টিকাল	শ্রীকিরণশঙ্কর রায়	১৬৬
বই পড়া	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	১৯৯
বন্ধু (গল্প)	শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার	৩১৩

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
বাঙ্গালীর শিক্ষা ...	শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ...	...	৬৭
বিবাহের পণ	শ্রীহরপ্রসাদ বাগচী ...	...	৯০
ভারতবর্ষঃ মানসী মূর্ত্তি ...	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	...	৮
মুক্তি (কবিতা) ...	স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	...	১
রবীন্দ্রনাথের পত্র ...	... ...	...	১১৭
রোম	শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ...	...	৩৬১
শাস্ত্র ও স্বাধীনতা ...	শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ ...	...	২৭৪
সমুদ্রের ডাক (গল্প) ...	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	...	১৭৫
সাহিত্যের জাতরক্ষা ...	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	...	২২২, ৩৪৮
৺চন্দ্রনাথ বসুর পত্র ...	... ...	...	৩২৯

সূচীপত্র।

(১৩২৫, কার্ত্তিক—চৈত্র)

অবরোধের কথা ...	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	... ৫১৬
অভিভাষণ ...	স্যর শ্রীআশুতোষ চৌধুরী	... ৫৭৭
আর্য্যামি	শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ...	... ৬৯৪
একটী অসম্ভব গল্প ...	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	... ৬৭১
একটি প্রেমের গান ...	ঐ ঐ ...	... ৩৯৯
একতারা (সমালোচনা)...	শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক ...	... ৪৯৫
খাঁটি বাঙালী ...	শ্রীকিরণশঙ্কর রায় ...	... ৫৯২
গ্রীস ও রোম ...	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী	... ৩৮৯
দেবী (কবিতা) ...	শ্রীকালিদাস রায় ...	... ৬১৭
দেশের কথা ...	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ...	... ৫৫০
নব বসন্তে	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী ...	... ৬৪৪
নীতিশিক্ষা	ইস্কুল মাষ্টার ...	... ৬১৯
পাটেল বিল ...	শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর ...	... ৬০৪
পাটেল বিল ...	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী	... ৬৫৮
বাঙলা কি পড়ব ...	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ...	... ৪০৮
বাঙলা ভাষার কুলজী ...	শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়	... ৪৫৯
ভারতবর্ষ সভ্য কিনা ?	বীরবল	... ৬৩২
ভূতের বোঝা ...	শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ ...	... ৫৬১

রাম ও শ্যাম (গল্প) ...	বীরবল	... ৪৭১
রুবেইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (কবিতা)	শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ ...	... ৫৬০
সম্পাদকের নিবেদন ...	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ...	... ৭১৩
সামাজিক সাহিত্য ...	শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত ...	... ৬৮৭
সাহিত্য ও নীতি ...	শ্রীযতীন্দ্র নাথ বসু ...	... ৫০৪
স্বর্গ-মর্ত্ত্য ...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	... ৬৪৯

মুক্তি।

ডাক্তারে যা বলে বলুক্ না কো,
রাখো রাখো খুলে রাখো,
শিওরের ঐ জান্‌লা দুটো,—গায়ে লাগুক্ হাওয়া।
ওষুধ ? আমার ফুরিয়ে গেছে ওষুধ খাওয়া!
তিতো কড়া কত ওষুধ খেলেম এ জীবনে,
দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে!
বেঁচে থাকা, সেই যেন এক রোগ ;
কত রকম কবিরাজী, কতই মুষ্টিযোগ,
একটু মাত্র অসাবধানেই বিষম কর্ম্মভোগ।
এইটে ভালো, ঐটে মন্দ, যে যা বলে সবার কথা মেনে,
নামিয়ে চক্ষু, মাথায় ঘোমটা টেনে,
বাইশ বছর কাটিয়ে দিলেম এই তোমাদের ঘরে।
তাই ত ঘরে পরে,
সবাই আমায় বল্লে, লক্ষ্মী সতী,
ভালো মানুষ অতি!
এ সংসারে এসেছিলেম ন' বছরের মেয়ে,
তার পরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে

দশের ইচ্ছা বোঝাই-করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে।
সুখের দুখের কথা,
একটুখানি ভাব্‌ব এমন সময় ছিল কোথা!
এই জীবনটা ভালো, কিম্বা মন্দ, কিম্বা যা-হোক্ একটা-কিছু,
সে কথাটা বুঝ্‌ব কখন, দেখ্‌ব কখন ভেবে আগু পিছু।
একটানা এক ক্লান্ত সুরে
কাজের চাকা চল্‌চে ঘুরে ঘুরে।
বাইশ বছর রয়েছি সেই এক চাকাতেই বাঁধা,
পাকের ঘোরে আঁধা।
জানি নাই ত আমি যে কি, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কি অর্থে যে ভরা!
শুনি নাই ত মানুষের কি বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি,
রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা,
বাইশ বছর এক-চাকাতেই বাঁধা।
মনে হচ্চে সেই চাকাটা—ঐ যে থাম্‌ল যেন;
থামুক তবে! আবার ওষুধ কেন?

বসন্তকাল বাইশ বছর এসেছিল বনের আঙিনায়।
গন্ধে বিভোল দক্ষিণ বায়
দিয়েছিল জলস্থলের মর্ম্ম-দোলায় দোল্;

হেঁকেছিল, "খোল্‌রে দুয়ার খোল্!"
সে যে কখন আস্‌ত যেত জান্‌তে পেতেম না যে।
হয় ত মনের মাঝে
সঙ্গোপনে দিত নাড়া; হয় ত ঘরের কাজে
আচম্বিতে ভুল ঘটাত; হয় ত বাজ্‌ত বুকে
জন্মান্তরের ব্যথা; কারণ-ভোলা দুঃখে সুখে
হয় ত পরাণ রইত চেয়ে যেন রে কার পায়ের শব্দ শুনে,
বিহ্বল ফাল্গুনে।
তুমি আস্‌তে আপিস থেকে, যেতে সন্ধ্যা-বেলায়
পাড়ায় কোথা সতরঞ্চ খেলায়।
থাক্ সে কথা!
আজ্‌কে কেন মনে আসে প্রাণের যত ক্ষণিক ব্যাকুলতা!

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জান্‌লা দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠ্‌চে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেচে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হ'ত সন্ধ্যা-তারা ওঠা,
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল-ফোটা।
বাইশ বছর ধরে'
মনে ছিল বন্দী আমি অনন্তকাল তোমাদের এই ঘরে।

দুঃখ তবু ছিল না তার তরে,
অসাড় মনে দিন কেটেচে, আরো কাট্‌ত আরো বাঁচলে পরে!
যেথায় যত জ্ঞাতি
লক্ষ্মী বলে করে আমার খ্যাতি;
এই জীবনে সেই যেন মোর পরম সার্থকতা—
ঘরের কোণে পাঁচের মুখের কথা!
আজ্‌কে কখন মোর
কাট্‌ল বাঁধন-ডোর!
জনম মরণ এক হয়েচে ঐ যে অকূল বিরাট মোহনায়,
ঐ অতলে কোথায় মিলে যায়,
ভাঁড়ার-ঘরের দেওয়াল যত
একটু ফেনার মত।
এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিয়ের বাঁশি বিশ্ব-আকাশ মাঝে।
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধূলায় পড়ে থাক্!
মরণ বাসরঘরে আমায় যে দিয়েচে ডাক
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু,
হেলা আমায় করবে না সে কভু!
চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে।
গ্রহতারার সভার মাঝখানে সে
ঐ যে আমার মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে হোথায় রইল নির্নিমেষে।

মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারী!
দাও, খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হ'তে পার করে দাও কালের পারাবার!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতবর্ষ।

(মানসী মূর্ত্তি)

—:*:—

যে দিন জলধি-গর্ভ হ'তে ভারতভূমি আপনার মস্তক উত্তোলন করলেন সে দিন বুঝি অন্তরীক্ষে অন্তরীক্ষে দেবতারা সহর্ষে আনন্দ-ধ্বনি করে' তার আবাহন করেছিলেন—আকাশ পথে দিব্যাঙ্গনারা বিচরণ করতে করতে থেমে গিয়ে তাঁদের আনন্দ-পুলকিত আঁখি নত করে' একবার চেয়ে দেখেছিলেন—গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ রক্ষ শূন্যপথে সব মিলিত হ'য়ে কৌতূহলোদ্দীপ্ত-চিত্তে জোড়-করে এ ধরিত্রীর পানে চেয়ে প্রণত হয়েছিল। সে দিন ঊর্দ্ধে অধঃ, পূর্ব্বে পশ্চিমে ঘোষিত হ'য়ে গিয়েছিল যে এই ভারতবর্ষে বিশ্বমানবের এক মহালীলা সংঘটিত হবে।

* * * * *

তারপর কে জানে কতযুগ ধরে' লোকচক্ষুর অন্তরালে জগৎ-জননী ভারতভূমি, আপনার অন্তর বাহির অতুল ঐশ্বর্য্যে ভরে' তুলেছিলেন—আপনার লোভাতুর সন্তানদিগকে আপনার বুকে ভুলিয়ে আন্‌বার জন্যে। পদতলে তাঁর সফেন-তরঙ্গ পাগল সিন্ধুর অতল তলে কোটি কোটি শুক্তি-হৃদয় মুক্তায় মুক্তায় ভরে' উঠ্‌ল—খনিতে খনিতে কত মণি

মাণিক্য লালসাময় জ্যোতি বিকীরণ করে' চক্ মক্ করে' উঠ্‌ল—কল-নাদিনী গঙ্গা, সিন্ধু, কাবেরীর তীরে তীরে স্নিগ্ধ-শ্যামল বৃক্ষ-তল সুস্নিগ্ধ ছায়ায় ছায়ায় ভরে গেল—বসুমতী আপনার বুক চিরে অনন্ত স্নেহরসে অভিষিক্ত অপর্য্যাপ্ত অন্নদান করবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

* * * * *

তারপর কে জানে কোন সুদূর অতীতের একদিন, কোন্ এক চিরতুষারাবৃত, চিরকুয়াশাচ্ছন্ন দেশে জগত-জননী ভারত মাতার প্রথম আহ্বান গিয়ে পৌঁছিল। মানুষের স্মৃতির পটে বিলুপ্ত-প্রায় সেই অভিযান-কাহিনী কে জানে? কে জানে কত মরুর নিষ্ঠুর বক্ষের উপর দিয়ে, কত কত পর্ব্বত মালার দুরারোহ অভ্র-চুম্বিত চূড়া অতিক্রম করে', কত গহনঘন কান্তারে গোপন পথ খুঁজে খুঁজে, কত বৎসর পরে এই কল-নাদিনী নদী-সিক্ত ছায়া-স্নিগ্ধ জগন্মাতার শ্যামল-বুকে নিবিড় নীল আকাশের তলে পৌঁছে গিয়েছিল, মানব সভ্যতার সেই প্রথম পুরোহিতের দল—উন্নতশির, প্রশস্তললাট, বিশালবক্ষ, তেজো-পুঞ্জ দৃষ্টি, সরল সবল কলেবর। মানব সভ্যতার প্রথম পুরোহিত ব্রাহ্মণ-বেশে জগন্মাতার বুকে এই বিশ্বমানবের মহালীলার প্রাঙ্গনে প্রবেশ করল।

* * * * *

আজ আমি আমার মানস নয়নে দেখতে পাই যে সেই চিরতুষারা-বৃত চিরকুয়াশাচ্ছন্ন দেশ ছেড়ে যে দিন সেই সিন্ধুতীরে তাঁদের চোখের

সাম্‌নে পূর্ব্ব-দিগন্ত কনক রাগে রঞ্জিত করে', জবাকুসুম-সংকাশ কাশ্যপেয় মহাদ্যুতি ধীরে ধীরে দিক-চক্রবালের নীচ থেকে আপনাকে তুল্‌লেন, সে দিন কি এক অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ে তাঁদের চিত্ত মন প্রাণ সব ভরে' উঠেছিল। সেই মহাদ্যুতির করস্পর্শে পৃথিবীর অন্ধকার দূর হ'ল। মানুষের মনের অন্ধকার দূর হবার সূত্রপাত হ'ল সে দিন, বিশ্বমানব ইতিহাসের সে এক জ্যোতির্মণ্ডিত চিরস্মরণীয় দিন।

* * * * *

হিন্দুর সেই একদিন গিয়েছে যে দিন পঞ্চনদতীর-ভূমে বনে বনে তাপস-কবির আন্দোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে সাম গান শুনে তরু লতা মুঞ্জরিত হ'য়ে উঠ্‌ত—বৃক্ষে বল্লরিতে ফুল ফুটে উঠ্‌ত। সেই ছায়া-সুনিবিড় বনে বনে সারা দ্বিপ্রহর আর মধুপ-গুঞ্জনের বিরাম নেই—বনকপোতের প্রাণ-উদাস করা ডাকের আর অন্ত নেই—বৃক্ষতলে শুষ্ক পত্রপুঞ্জে মর্ম্মর ধ্বনি তুলে সর্ সর্ করে' বাতাসের আনাগোনার আর বিরতি নেই ;—সেই বনভবনে শান্তি-সমাকুল পর্ণকুটীরে কত কত ঋষি এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন কর্‌বার জন্যে ধ্যান-নিরত। হিন্দুর জীবনের ইতিহাসে সেই একদিন গিয়েছে।

* * * * *

ধীরে ধীরে—ধীরে ধীরে মানুষ আপনাকে চিন্‌ল—আপনার অধিকার বুঝ্‌ল। আনন্দে বিশ্বাসে শ্রদ্ধায় তাদের সকল হৃদয় ভরে' উঠ্‌ল। তাদের কণ্ঠ-সঙ্গীত পঞ্চনদের তীরে তীরে ছায়া সুনিবিড়

বনে বনে অনন্ত আকাশকে মুখরিত পুলকিত আকুলিত করে' তুল্‌ল। আপন প্রাণের অদম্য আনন্দ-উচ্ছ্বাসে তারা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন কর্‌লে। অন্ন আপনাকে বহু করলেন—প্রজা বহু হ'ল। পল্লী প্রতিষ্ঠা হ'ল—নগর নগরী বিনির্ম্মিত হ'ল—রাজ্য গঠিত হ'ল—সাম্রাজ্য স্থাপিত হ'ল। মানুষ আত্মবলে আপনাকে জয়যুক্ত করে' ভগবানকে সার্থক করে' তুল্‌ল।

* * * * *

তারপর কত যুগ ধরে' এই জগন্মাতার বুকের উপর একে একে কত লীলা হ'য়ে গেল—কত জ্ঞানশক্তি—ঐশ্বর্য্য সম্পদ—কত মহত্ব গৌরব—কত ঘাত প্রতিঘাত, শান্তি সংগ্রাম—কত রক্তস্রোত কত প্রীতি ধারার ভিতর দিয়ে দিয়ে, বসুন্ধরা তাঁর সন্তানদিগকে নিয়ে চল্‌লেন—হিন্দুর সে-জীবনের কাহিনী আজ মানবের স্মৃতিতে বিলুপ্ত-প্রায়।

* * * * *

অনন্ত অতীতের মসীময় অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীপ্রভাতে, ইতিহাস যখন বিস্মৃতির করাল-কবল হ'তে মানুষের লীলাধারাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে ঊষার ক্ষীণ আলোকে লেখনী হস্তে বদ্ধপরিকর হ'ল—তখনও সেই সুদূর অতীতের আধ-আলো আধ-অন্ধকারের মধ্যে তার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যে আলেখ্য লিখিত হ'ত তাতে দেখি তখনও হিন্দুর গৌরবের দিন গত হয় নি। তারপর ধীরে ধীরে দিনে দিনে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আলেখ্য-রাজি স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হ'তে লাগ্‌ল—তখনও

হিন্দুর গৌরবের দিন গত হয় নি। তারি একদিন—আজ মনে পড়ে—আসমুদ্র হিমাচল ভারতের নরনারী একপ্রাণে অশোকের ছত্র-পতাকা-তলে সমবেত হয়েছিল। সে দিন দিকে দিকে ভারতের বাণী বহন করে' লোক্ ছুট্‌ল। উত্তুঙ্গ ভূধর তাদের গতি রোধ কর্‌তে পার্‌ল না। অকূল পারাবারের উত্তাল তরঙ্গ-মালা তাদের পথ করে' দিলে। অমৃতের সন্ধান পেয়ে সে দিনের হিন্দুরা সে-অমৃত নিয়ে বিশ্ববাসীর দ্বারে দ্বারে ফির্‌ল।

* * * * *

তারপর তেম্‌নি আর একদিন উজ্জয়িনীর কনক-পুরীতে জগন্মাতা হিন্দুর সভ্যতার যে এক অভ্রভেদী মন্দির গড়ে' তুলেছিলেন—ঐশ্বর্য্য গৌরব, জ্ঞান, শক্তি দিয়ে ভরে' তুলেছিলেন—সে কাহিনী আজও হিন্দুর মনে সহস্র নৈরাশ্যের অন্ধকারের মাঝে স্বর্ণরেখার মতো উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। আজ আমি মানস-নয়নে দেখ্‌তে পাই—সেই স্বুবর্ণপুরী উজ্জয়িনী—সেই উজ্জয়িনীর পথে পথে নরনারী কলহাস্যে গতিলাস্যে নির্ভীক উন্নতশিরে বিচরণ কর্‌ছে—পথ-পাশে পাশে সহস্র বিপণিতে পণ্যরাজির আর অন্ত নেই—সে-দিন বাতাসে বাতাসে ক্ষুব্ধ হাহাকারের পরিবর্ত্তে আনন্দোচ্ছ্বসিত কলহাস্য—আকাশে আকাশে খিন্ন দীর্ঘশ্বাসের পরিবর্ত্তে তৃপ্তির সুখান্বিত হিল্লোল—মানুষের অন্তরে অন্তরে মৃত্যুর পরিবর্ত্তে, অনন্ত দুরাশা, দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবার শক্তি। মানস-নয়নে আমি দেখ্‌তে পাই—সে দিন উজ্জয়িনীর অসংখ্য চতুষ্পাঠীতে কত কত দিক দেশ হ'তে কত নরনারী এসে জগন্মাতার

চরণে শিষ্য বেশে তাঁর অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে দু'এক খানি রত্ন নিয়ে আপনাকে ধন্য মনে কর্‌ছে—নগর নগরীতে সে দিন উৎসবের আর শেষ নেই—পল্লীতে পল্লীতে শিশুদের কলরবের আর শ্রান্তি নেই—শস্য-শ্যামল সহস্র পল্লীর পাশে পাশে অগণ্য নদীতে নদীতে কল কল ছল ছল হাস্যের আর বিরতি নেই। স্বর্ণ-সিংহাসনে হিন্দু সম্রাট স্বর্ণ ছত্র তলে স্বর্ণ দণ্ড করে, দুষ্টের শাসন ও শিষ্টের পালন করছেন—রাজসভা হিন্দুর জ্ঞানে শক্তিতে শ্রদ্ধায় প্রীতিতে অলঙ্কৃত—রাজভাণ্ডার মুক্তহস্ত—ধরিত্রীর এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত দেবতার আশীর্ব্বাদে সমুজ্জ্বল। সে দিনের ছবি আমি মানস-নয়নে দেখি আর কোথা হতে দুই বিন্দু অশ্রুজলে আমার আঁখিপাত সিক্ত হ'য়ে ওঠে।

* * * * *

তারপর আরও একদিন—শুধু একদিন কেন!—আরও কতদিন—কত বর্ষ—কত শতাব্দী—এই জগন্মাতার বুকে হিন্দু জ্ঞানে ঐশ্বর্য্যে, শক্তিতে, ভক্তিতে, কর্ম্মে, ভোগে আপনাকে সার্থক করে' তুলেছিল। সেই অতীতকালে তরঙ্গোচ্ছাসিত অকূল পারাবারের বুকে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মতো শুভ্র পাল তুলে হিন্দুর অর্ণবতরণী কত কত পণ্য-সম্ভার জ্ঞান-সম্ভার নিয়ে দিগন্তের পরপারে কত কত দেশে ছুট্‌ল—কত কত দেশ হ'তে অর্ণবযান সপ্তসিন্ধু পার হয়ে, কত কত ঐশ্বর্য্য সম্পদ—কত কত ভক্তি প্রীতি নিয়ে হিন্দুর বন্দরে বন্দরে এসে লাগ্‌ল। কত যুগ ধরে হিন্দু এক হাতে শক্তি আরেক হাতে প্রেম—একদিকে কর্ম্ম আর একদিকে জ্ঞান—একদিকে ঐশ্বর্য্য আর একদিকে মুক্তি নিয়ে,

আপনাকে জান্‌ল ও বিশ্ববাসীকে জানাল। তারপর ধীরে ধীরে হিন্দুর লীলার দিন ফুরিয়ে এল। জগন্মাতার দ্বিতীয় আহ্বান কোন্ এক নবীন জাতির অন্তরে গিয়ে বাজ্‌ল।

* * * * *

হিন্দুকুশের পরপারে একি গুঞ্জন-ধ্বনি আজ শুনি! যবনিকার অন্তরাল হ'তে কত লক্ষ লোকের উৎসাহ-কলরব—প্রাণের হুঙ্কার আজ হিমাদ্রির বিরাট পঞ্জর ভেদ করে', মৃদু গুঞ্জনের মতো এ-পারের আকাশ বাতাসকে চঞ্চল কর্‌ল। কাণ পাত—ঐ কি শোনা যায়—প্রবল কোলাহলের মধ্য হতে মাঝে মাঝে প্রবলতর হুঙ্কারে ধ্বনিত হচ্ছে—"লায় লা হায় লাল্লা মহম্মদ রসুলাল্লা"! গহণ তিমিরাবৃত নিশীথের ব্যত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গ সংক্ষুব্ধ সিন্ধুর ঊর্ম্মিমালার মতো কোন্ নবীন জাতি আজ অদম্য প্রাণের বেগে আপনাকে আর আপনার মধ্যে ধরে' রাখ্‌তে পার্‌ছে না। তাকে বেরুতে হবে—বেরুতে হবে আজ আকুল স্রোতস্বিনীর মতো—হিমাদ্রির বক্ষ বিদীর্ণ করে'—কানন কান্তার, পল্লী, নগরী, মরু, গিরি ভাসিয়ে নিয়ে—আপনারই প্রাণের বেগে—গতির আনন্দে—আনন্দের আতিশয্যে। ধীরে ধীরে গুঞ্জন-ধ্বনি স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হ'ল—আরও স্পষ্ট—আরও স্পষ্ট—তারপর একদিন হিমাদ্রির বিরাট পঞ্জর ভেদ করে'—অর্দ্ধচন্দ্র আঁকা বিজয় বৈজয়ন্তী পতাকা উড়িয়ে—উন্মুক্ত-কৃপাণ লক্ষ লোক—জগত-পিতার নাম হুঙ্কার কর্‌তে কর্‌তে সিন্ধুর তীরে তীরে শার্দ্দূলের মতো দেখা দিল। কৃপাণে কৃপাণে সংঘাত হ'ল—শূলে শূলে সংঘর্ষ হ'ল—

অশ্ব-খুরোত্থিত ধূলিতে মেদিনী আচ্ছন্ন হ'ল—বিজয়ীর বিজয় হুঙ্কারে বিজিতের নিরাশা-চিৎকারে আকাশ বাতাস প্রপীড়িত হ'ল। মানব-শোণিতে ধরণী রঞ্জিত!—নদনদীর লোহিতাক্ত কলেবরে—হিন্দুর গৌরব-সূর্য্য ধীরে ধীরে অস্তমিত। মানব-সভ্যতার দ্বিতীয় পুরোহিত ক্ষত্রিয় বেশে জগন্মাতার বুকে বিশ্বমানবের মহালীলা প্রাঙ্গনে প্রবেশ কর্‌ল।

* * * * *

তারপর সপ্ত শতাব্দী ধরে' এই দুই মহাজাতি বিরোধে মিলনে, শান্তিতে সংগ্রামে, ভয়ে ভক্তিতে পরস্পর পরস্পরের কাছে আপনাকে পরিচিত কর্‌তে কর্‌তে চল্‌ল—পরস্পর পরস্পরকে জয় কর্‌তে কর্‌তে চল্‌ল। তাই এই সপ্ত শতাব্দী ধরে' কখনও মহাকালীর তাণ্ডবনৃত্যে দিগ দিগন্তে বজ্রশিখা ছড়িয়ে গেল—মেদিনী কম্পমান হল—দেবালয় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধূলিতে মিশেয়ে গেল—মানব রুধিরে বসুন্ধরা রঞ্জিত হ'ল;—আবার কখনও বরাভয়করা জগতজননীর প্রশান্ত হাস্যে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বনে বনে ফুল ফুট্‌ল—বিহঙ্গ কাকলীতে কাননভূমি মুখরিত হ'ল—দিগন্তপ্রসারী শ্যামাঙ্গিনীর বুকে বুকে শ্যামশস্য আপনার মায়া বিছিয়ে দিল—শান্তির প্রলেপে যত ব্যথা সব মুছে গেল। ধীরে ধীরে মন্দিরের পাশে পাশে মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হল—হিন্দুর অন্তরে অন্তরে মুসলমান ফকিরের জন্য আসন পাতা হ'ল। ধীরে ধীরে এই দুই মহাজাতি—হিন্দু মুসলমান—পরস্পর পরস্পরকে চিন্‌ল। বুঝ্‌ল তারা যে এমন একটা স্থান আছে যেখানে তাদের বিরাট ঐক্য—বুঝ্‌ল তারা

যে সর্ব্ব প্রথমে তারা মানুষ—আর মানুষ মানুষের কাছে যা চায় সেটা সংগ্রামের মধ্যে নেই—অবজ্ঞার মধ্যে নেই—বিচ্ছেদের মধ্যে নেই, আছে সেটা প্রীতির মধ্যে— মিলনের মধ্যে—শান্তির মধ্যে, মানুষের বিরোধ সে দু'দিনের—মানুষের প্রেম সে অনন্ত। যারা একদিন উদ্ধত-হৃদয়ে উন্মুক্ত কৃপান নিয়ে জয় কর্‌তে এলো তারা ধীরে ধীরে পরাজয় মানল—যারা একদিন শত্রুর বেশে জগন্মাতার বুকে তাণ্ডব-নৃত্য কর্‌লে তাদেকে আর একদিন অনন্তস্নেহে অভিষিক্ত করে' জগন্মাতা আপনার সন্তান করে' নিলেন।

* * * * *

সহসা আজ সিন্ধুর কল কল ছল ছল দ্বিগুনতর হ'য়ে উঠ্‌ল কেন! সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে হিন্দু মুসলমান বিস্মিত হ'য়ে দেখ্‌ল পশ্চিম-দিক চক্রবালে পারাবার-বুক তরণীতে তরণীতে ছেয়ে গেছে। পালে পালে প্রভঞ্জনের হাওয়া তাদের, ক্ষুধার্ত্ত শ্যেন পক্ষীর মতো সাঁ সাঁ করে' ছুটিয়ে চলেছে—হিমাদ্রি সমান তরঙ্গের বক্ষ বিদীর্ণ করে' করে'—শুভ্র ফেন-পুঞ্জে-পুঞ্জে বারিধি-হৃদয় আচ্ছাদিত করে' করে' ছুটে আস্‌ছে সহস্র তরণী তাদেরি পানে। ধীরে ধীরে কখন গোধূলী আপনার স্বর্ণাঞ্চল খানি টেনে নিয়ে দূর দিগন্তের গায়ে মিশিয়ে গেল—ধীরে ধীরে, সন্ধ্যারাণী এসে দিবসের শেষরশ্মি রেখাটুকু আপনার অসিত অঞ্চলে মুছে নিলেন—তখন সেই আধআলো আধঅন্ধকারের মাঝে সহস্র তরণী এসে তটে লাগ্‌ল। হিন্দু মুসলমান বিস্মিত হ'য়ে দেখ্‌ল সেই সহস্র তরণীতে এক নবীন মনুষ্য—শ্বেতবর্ণ—নীলচক্ষু—পিঙ্গলকেশ কৌতূহলোদ্দীপ্ত তারা জিজ্ঞেস কর্‌ল—"তোমরা কে?"

"আমরা বণিক।"

"তোমাদের পণ্য সম্ভার কি?"

"পণ্য আমাদের নূতন প্রাণের নবীন উৎসাহ—তরুণ হৃদয়ের অনন্ত দুর্নিবার আশা আকাঙ্খা—তপ্ত রক্তস্রোত-প্রবাহিত ধমণীর দুরন্ত কর্ম্ম-পিপাসা—ধরিত্রীর সন্তান আমরা—সপ্তসিন্দুর মানস-পুত্র আমরা।"

হিন্দু মুসলমান বল্‌লে—"তোমাদের পণ্য আমরা জানি না। তাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তবে এ জগন্মাতার দেশ—সবার অবারিত দ্বার। এসো—তোমারও স্থানের অভাব হবে না।" বিদেশী বণিক তার পণ্য সম্ভার নিয়ে কূলে অবতরণ কর্‌ল। মানব-সভ্যতার তৃতীয় পুরোহিত বৈশ্যবেশে এ জগন্মাতার কূলে বিশ্বমানবের মহালীলা প্রাঙ্গনে প্রবেশ কর্‌ল।

* * * * *

তারপর যখন রজনী প্রভাত হল তখন সেই বিদেশী বণিকের একদল চমৎকৃত হ'য়ে দেখ্‌চে যে তাদের অজ্ঞাতসারে—কখন তাদের লোহার তূলাদণ্ড সোনার রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছে।

* * * * *

এখন এই যে তিন মহাজাতি—এই যে হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চিয়ান—এই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—এই তিন মহাজাতিকে মন্থন করে' কত হলাহলের পর কবে কোন্ অমৃত উঠ্‌বে তা কে জানে? তবে অমৃত যে একদিন উঠ্‌বেই সে-বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নব-বিদ্যালয়।

—:০:—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীচরণেষু—

ক্যাটালগ ঘাঁটা যাঁদের অভ্যাস আছে, তাঁরাই জানেন্ যে এমন সব বই আছে যার নাম পড়েই তা পড়্তে লোভ হয়। আপনি আমাকে যে ফরাসী বইখানি পাঠিয়েছেন, সেখানি হচ্ছে ঐ জাতের। "নব-বিদ্যালয়", এই নাম পড়েই, এই বইয়ে অনেক নূতন সত্যের সাক্ষাৎ লাভ কর্‌বার আশা আমার মনে জেগে উঠল ; এবং শুনে সুখী হবেন যে, বইখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করে সে আশায় আমি নিরাশ হই নি। আমাদের দেশের স্কুলকলেজের প্রতি আমরা অনেকেই যে অসন্তুষ্ট—তার প্রমাণ ত আমাদের লেখায় বক্তৃতায় নিত্যই পাওয়া যায়। আমাদের স্কুলকলেজে আমাদের ছেলেরা যে মানুষ হচ্ছে না, এ কথা ত ঘরে বাইরে দু'বেলা শুন্‌তে পাই ; কিন্তু কি কর্‌লে যে তা হবে, সে বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা বড় বেশি লোকের মাথায় নেই। তা যদি থাক্‌ত, তাহলে আমাদের এমন কথা শুন্‌তে হ'ত না যে, ইংরাজি পড়েই বাঙালীর ম্যালেরিয়া হয়েছে। এর পর ছেলেদের স্কুলকলেজ ছাড়িয়ে আবার পাঠশালা ও টোলে পাঠাবার প্রস্তাব দেশহিতৈষী লোকেরা যে করবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? এ প্রস্তাব

খুব পেট্রিয়টিক হতে পারে, কিন্তু মোটেই কাজের নয় ; কেননা শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর হওয়ার একমাত্র উপায় যে পশ্চাৎপদ হওয়া, এ বিশ্বাস যাঁদের আছে—তাঁরাও সে বিশ্বাস অনুসারে নিজেরা কাজ কর্‌তে প্রস্তুত নন্। সভা-সমিতিতে স্কুলকলেজের উপর ঝাল ঝেড়ে আমরা নিজেদের ছেলেদের আবার সেই স্কুলকলেজেই পাঠাই। ফল কথা এই যে, যে ভাবে শিক্ষা চল্‌ছে সে ভাবে তা চলা উচিত নয়—এ কথা বলায় ততক্ষণ কোনই লাভ নেই, যতক্ষণ না কি করে তা চালানো উচিত, সে কথা আমরা বল্‌তে পারি। সে কথা যে আমরা বল্‌তে পারি নে, তার কারণ শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা যেমন অজ্ঞ তেমনি উদাসীন।

(২)

ইউরোপেও আজকাল সে দেশের সনাতন শিক্ষা-পদ্ধতির প্রতি অনেকেই অসন্তুষ্ট। সেই অসন্তোষের ফলে বেলজিয়ম, জর্ম্মাণী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে গুটি-কয়েক নব-বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই বইখানিতে এর মধ্যে একটি স্কুলের শিক্ষার প্রকরণ-পদ্ধতির আমূল বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এতে যা আছে তা মামুলি স্কুলের গ্লানাড়ি সমালোচনা নয়। আসলে এতে সরকারি শিক্ষার এক বর্ণও সমালোচনা নেই। গ্রন্থকার স্বয়ং একটি নব-বিদ্যালয়ের স্রষ্টা এবং সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা। তিনি সুইট্‌জারল্যাণ্ডের শিক্ষকমণ্ডলী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে, তাঁর স্কুলের উদ্দেশ্য এবং উপায় সম্বন্ধে মুখে যে-সকল কথা বলেছেন, সেই সকল কথা একত্র করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

গ্রন্থকারের একটু পরিচয় দিই। ইনি ছিলেন বেলজিয়ামের নব-ইউনিভারসিটির একজন অধ্যাপক। এঁর নাম Faria de Vasconcellos; শিক্ষাই এঁর ধর্ম্ম, শিক্ষাই এঁর কর্ম্ম, এবং স্বজাতির শিক্ষার উন্নতি-কল্পেই ইনি জীবন উৎসর্গ করেছেন। প্রফেসার ফারিয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বেলজিয়ামে ব্রিজ নামক গ্রামে তাঁর এই নব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। জর্ম্মাণরা বেলজিয়াম অধিকার করবার পর এ স্কুল বন্ধ হয়, এবং প্রফেসার ফারিয়া জেনেভায় নির্ব্বাসিত হন। তাঁর অপরাধ, তিনি বিশ্বমানবের সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন, এবং সেই বিশ্বাসের উপরেই তিনি তাঁর নব-শিক্ষার পদ্ধতি গড়ে তোলেন। তাঁর মতে—এই যুগযুগান্তরের সভ্যতার ফলে মানুষ তার আদিম পশুত্ব হতে অনেকটা মুক্তিলাভ করেছে, এবং তাঁর দৃঢ় ধারণা যে মানুষের সঙ্গে মানুষের মারামারি কাটাকাটির মূলে যা আছে তা মানবধর্ম্ম নয়—পশুপ্রবৃত্তি। মানুষের অন্তরে তার আদিম হিংস্রতা আজও লুপ্ত হয় নি—শুধু সুপ্ত হয়ে রয়েছে। যে শিক্ষার বলে মানুষের ভেদবুদ্ধি প্রবল হয়, সে শিক্ষার ফলে মানুষের আদিম পশুত্ব জেগে ওঠে, এবং nationalism প্রভৃতি কথার সাহায্যে ছেলেদের অন্তরে সেই সুপ্ত ব্যাঘ্রকেই জাগ্রত করে তোলা হয়; সুতরাং শিক্ষার মন্দির থেকে ও-সকল শব্দ বহিষ্কৃত করে দেওয়াই কর্ত্তব্য। তাঁর স্কুলের ছেলেদের মনে তিনি বিদেশী ও বিজাতির প্রতি মৈত্রীর ভাব উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন; তার ফলে তিনি বলেন—তারা মানুষ হয়েছে, অথচ কাপুরুষ হয় নি। প্রমাণ, শত্রুর আক্রমণ থেকে স্বজাতি ও স্বদেশকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর স্কুলের বড়ছেলেরা অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। নিজে পশু না হলে যে, পশুর

বিরুদ্ধে দাঁড়ান যায় না—এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন, যদিচ অনেক বুদ্ধিমান লোকের মত তাই। বেলজিয়ামের উপর জর্ম্মাণী যে নিষ্ঠুর ও প্রচণ্ড আঘাত করেছে, তাতে প্রফেসার ফারিয়ার উক্ত বিশ্বাস ঘা খেয়েছে—কিন্তু ভাঙ্গা দূরে যাক্, টলেও নি। যে সময়ে জর্ম্মাণরা সমগ্র বেলজিয়ামকে পদদলিত পীড়িত ও বিধ্বস্ত কর্‌ছিল, সেই সময়ে তিনি জেনেভা-সহরে এই কথা বলেন—

"এ দুর্দ্দিনেও মানবসভ্যতার প্রতি আমাদের আস্থা এবং শ্রদ্ধা সমান অটল রয়েছে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে,—ব্যক্তির উপরে, জাতির উপরেও, মানবাত্মা বলে একটি পদার্থ আছে। এই যুদ্ধের পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা ও বীভৎস অত্যাচারেও মানুষের আত্মার প্রদীপ কখনও নির্ব্বাপিত হবে না; সে অক্ষয় প্রদীপের চিরবর্দ্ধমান শিখা যুগের পর যুগে যত ঊর্দ্ধে আরোহণ করবে, বিশ্বমানবের জীবনের পথ তত আলোকিত হয়ে উঠবে"।

এর পর বোধহয় এ কথা স্পষ্ট করে বলবার দরকার নেই যে, প্রফেসার ফারিয়া একজন ঘোর Idealist; কিন্তু তার থেকে যদি কেউ মনে করেন যে তিনি একজন খেয়ালি লোক, এবং তাঁর স্কুল হচ্ছে একটি খামখেয়ালি ব্যাপার,—তাহলে তিনি নিতান্তই ভুল করবেন। এই ছোট্ট বইখানির ভিতর তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে যে অগাধ জ্ঞান ও অসাধারণ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন, তা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। শিক্ষা জিনিসটে তিনি কবির চোখ দিয়েও দেখেন নি, দার্শনিকের চোখে দিয়েও নয়ণ সনাতন শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগই এই যে, সে পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক নয়,—ও হচ্ছে আসলে একটি আন্দাজি ব্যাপার। প্রচলিত শিক্ষা, শিশু ও বালকের শরীর মন ও

চরিত্রের সম্যক জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয় বলেই, সে-শিক্ষার রীতি হচ্ছে মনোজগতের অন্ধকারে ঢিল মারা। যে সত্য প্রমাণিত ও পরীক্ষিত, সেই সত্যের উপরেই তিনি তাঁর নব-শিক্ষাপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর স্কুলে ছেলেদের দৈহিক মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হত, কিন্তু ধর্ম্ম-শিক্ষা দেওয়া হত না। প্রফেসার ফারিয়া পাতায় পাতায় মানবাত্মার উল্লেখ করেছেন; কিন্তু মানবাত্মা বল্‌তে তিনি বোঝেন—মানুষের সেই ব্যবহারিক আত্মা, যার পরিচয় পাওয়া যায় পৃথিবীর দর্শনে, বিজ্ঞানে, কাব্যে, আর্টে, শিল্পে, বাণিজ্যে, সমাজে ও রাষ্ট্রে। তদতিরিক্ত অপর আত্মার সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নীরব; সে আত্মার অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এ বিশ্বাস তিনি করেন্ যে, সে বস্তুকে শিক্ষা দেওয়া—আর যারই হোক্—তাঁর সাধ্য নয়। অর্থাৎ reality-র জ্ঞানের সাহায্যে দেহে মনে ও চরিত্রে সুস্থ সবল সক্রিয় ও সক্ষম মানুষ গড়ে তোলাই হচ্ছে তাঁর ideal, এবং একমাত্র এই ideal-এরই তিনি ভক্ত। এবং এই ধর্ম্মের সাধনপদ্ধতিই হচ্ছে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি।

(৩)

ইমারত গাঁথ্‌তে হলে মানুষের পক্ষে সব আগে তার গোড়াপত্তন করা আবশ্যক, এবং তার জন্য চাই জায়গা বাছা। প্রফেসার ফারিয়ার মতে যিনি একটি নব-বিদ্যালয় স্থাপন কর্‌তে চান্, তাঁর প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে ঐ জায়গা বাছাই করা। এই সহজ কথাটা যে মানুষে প্রায়ই ভুলে যায়, তার পরিচয় ত আমরা নিত্যই পাই। আমরা যেখানে

একটু ফাঁক পাই, সেইখানেই স্কুল বসিয়ে দিই। গাছ পোঁতবার সময়ও আমরা এর চাইতে ঢের বেশি সতর্ক হই; যেন গাছের জীবন মানুষের জীবনের চাইতে বেশি মূল্যবান।

প্রফেসার ফারিয়ার শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রথম সূত্র এই যে, স্কুলের উপযুক্ত স্থান হচ্ছে পল্লীগ্রাম, সহর নয়। সহর নামক ইঁটের পর্ব্বতের গুহায় আজন্ম বাস করে' মানবসন্তান যে, দেহ মন ও চরিত্রে পূর্ণ-শ্রী পূর্ণ-শক্তি লাভ করবার সুযোগ পায় না,—এ কথা আমরা ষোল-আনা মানলেও অনেকে এক কড়াও মানেন্ না। খোলা আকাশের তলায় পরিষ্কার আলো ও বাতাসের মধ্যে বাস করাই যে ছোট ছেলের শরীরের পক্ষে স্বাস্থ্যকর ও মনের পক্ষে শ্রেয়স্কর, এ কথা বুঝতে যাঁদের দেরি লাগে, তাঁদের জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাই যে, তাঁরা কি স্বচ্ছন্দচিত্তে তাঁদের ছেলেদের খনির গর্ভে মানুষ হতে দিতে স্বীকৃত হবেন,—হোক্ না সে খনি বিজুলি বাতিতে আলোকিত আর বিজুলি পাখায় ব্যজনিত? ছোট ছেলের পক্ষে সহর একটি কারাগার মাত্র, সে কারাগারে আমরা যে তাদের বন্ধ করে রাখ্‌তে কুণ্ঠিত হই নে, তার কারণ আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি হচ্ছে আসলে জেলের পদ্ধতি। সচরাচর স্কুল যে জেলখানার আদর্শেই গঠিত হয়, এ দুয়ের সাদৃশ্যের প্রতি নজর দিলে সকলেই তা প্রত্যক্ষ কর্‌তে পারবেন। এই জেলখানা থেকে ছেলেদের উদ্ধার করবার মানসেই ইউরোপে এই সব নব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। স্বাধীনতাই হচ্ছে এই সব স্কুলের মূলমন্ত্র; কেননা এদের কর্ত্তৃপক্ষেরা এই মহা সত্যের আবিষ্কার করেছেন যে, অবাধ স্বাধীনতার মধ্যেই মানুষ তার মনুষ্যত্ব লাভ করে, অর্থাৎ ঐ অবস্থাতেই তার দেহ মন ও চরিত্রের পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়; এবং বলা

বাহুল্য যে, ছোট ছেলেও মানুষ,—কেননা বৃদ্ধত্ব ও মানুষ্যত্ব এক বস্তু নয়। স্বচ্ছন্দে চলবার ফেরবার দৌড়বার লাফাবার জন্য ছেলেদের পক্ষে যে মাঠ চাই, এ কথা যে আজকাল অনেকেই মানেন্ তার প্রমাণ, সহুরে স্কুলও খেলার মাঠের জন্য লালায়িত। ছেলেরা কিন্তু শুধু জমির উপর ছুটোছুটি করেই সন্তুষ্ট থাকে না, তারা গাছে চড়্‌তে চায়, জলে নাম্‌তে চায়। একমাত্র স্থলচর হয়ে তাদের সুখ নেই, মাঝে মাঝে খেচর ও জলচর হতে পারলেই তারা আনন্দে থাকে। এ স্বাধীনতা তাদের দেওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সহরের খেলার মাঠে তারা সাঁতারও কাট্‌তে পারে না, ডালেও চড়্‌তে পারে না। সুতরাং স্কুল সেই জায়গাতেই হওয়া উচিত যেখানে মাঠ আছে, গাছ আছে, জল আছে।

আমরা সকলেই জানি যে, মানবজাতি তার শৈশবে প্রকৃতির কোলেই লালিতপালিত হয়েছে; সুতরাং মানব-শিশুর পক্ষে প্রকৃতির কোলেই মানুষ হওয়া স্বাভাবিক;—কেননা যাঁরা ছোট ছেলের মনের খবর রাখেন তাঁরাই জানেন যে, আদিম মানবের সঙ্গে তাদের প্রকৃতির একটা মজ্জাগত মিল আছে। মানবজাতি যেমন প্রকৃতির সঙ্গে কারবার করে', যুগের পর যুগ ধরে, দেখে এবং ঠেকে শিখে সভ্য হয়েছে; শিশুকেও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে মানুষ হতে হবে; এই হচ্ছে নব-বিদ্যালয়ের স্রষ্টাদের মত। প্রকৃতির হাত ধরে এবং প্রকৃতিকে হাতে ধরেই মানুষের মন যে সজ্ঞান এবং সক্রিয় হয়ে ওঠে, এই বিশ্বাসের বলেই নব-বিদ্যালয়ের নব-শিক্ষাপদ্ধতি রচিত হয়েছে। যখন মানসিক শিক্ষার অধ্যায়ে এসে পড়্‌ব, তখন সে পদ্ধতির নূতনত্ব ও সার্থকতার পরিচয় দেব। এস্থলে এইটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট

হবে যে, শিক্ষার এই নব-পন্থীদের মতে সহুরে স্কুলে তাঁদের পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া একেবারেই অসম্ভব; সুতরাং স্কুলের স্বস্থান হচ্ছে সহরের বাইরে।

স্কুলের আস্তানা সহরের বাইরে হলেও বহুদূরে হওয়া উচিত নয়—এই হচ্ছে প্রফেসার ফারিয়ার মত। তাঁর স্কুল ছিল ব্রাসেল্‌স্ থেকে পঞ্চাশ মিনিটের রেলের পথ। স্কুল যে একটি বড় সহরের এক ঘণ্টার রেলপথের বাইরে হওয়া উচিত নয়—এ বিষয়ে তিনি দৃঢ়মত। এ অবশ্য একটি নূতন কথা,—সুতরাং এ বিষয়ে তাঁর কি বক্তব্য আছে শোনা যাক্। তিনি বলেন্—

"লোকালয়ের বাইরে স্কুল স্থাপনা করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, আমরা আমাদের ছেলেদের একটা বড় সহরের সংস্পর্শ থেকে একেবারে দূরে রাখ্‌তে চাই;—কিম্বা রাজধানী নামক সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে মানুষের হৃদয়মনের শিক্ষার জন্য যে অতুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত রয়েছে, টল্‌ষ্টয়ের মত তা প্রত্যাখ্যান কর্‌তে চাই। এ কথাটা আমি খুব স্পষ্ট করে খুব উঁচু গলায় বল্‌তে চাই যে, এই প্রকৃতির কোলে ফিরে আসার অর্থ আমাদের কাছে এ নয় যে, আমরা বনবাসের কোনরূপ অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য কিম্বা দৈবী-শক্তিতে বিশ্বাস করি। সেরকম অদ্ভুত বিশ্বাস যে আমাদের নেই—এ কথাটা পরিষ্কার করে বলা আবশ্যক, কেননা প্রায়ই দেখ্‌তে পাই যে, এমন লোক ঢের আছেন যাঁদের ধারণা যে আমাদের নব-বিদ্যালয়ের প্রধান গুণই এই যে, আমরা সহরের সয়তানের বেড়াজাল ছিড়ে পালিয়ে এসেছি। লোকালয়-বহির্ভূত মাঠের মধ্যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করবার সুফল যে কি, তা পূর্ব্বেই বলেছি; কিন্তু সহরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখবার সুফল থেকেও আমরা ছেলেদের বঞ্চিত কর্‌তে চাই নে।"

আমাদের ভাষায় বল্‌তে হ'লে, ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ যে একই আশ্রম, প্রফেসার ফারিয়া এ কথা মানেন্ না। তাঁর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে সংসার থেকে পালাতে শেখানো নয়, তার জন্য তাকে প্রস্তুত করা। প্রথম আশ্রমের সার্থকতা হচ্ছে মানুষকে তার দ্বিতীয় আশ্রমের উপযোগী করায়। স্কুল সন্ন্যাসীর আশ্রমও নয়, ভিক্ষুর মঠও নয়। এঁদের মতে বিদ্যালয় হচ্ছে সংসার-রঙ্গালয়ের নেপথ্যশালা। জীবন নাটকের অভিনয় সকলকেই কর্‌তে হবে, সে নাটক ট্রাজেডিই হোক্ আর কমেডিই হোক; সেই অভিনয় ভাল করে' সুন্দর করে' কর্‌তে শেখানোটাই হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য,—সুতরাং সে শিক্ষাশালা প্রথমে নেপথ্যেই রাখা দরকার। শিক্ষানবিশীর যুগে সামাজিক জীবনের যবনিকার অন্তরালে যাবার এও একটা কারণ।

এখন দেখা যাক্, সহরের সঙ্গে স্কুলের সম্পর্কটা নিকট হওয়ায় ছেলেদের কি লাভ। মানুষের যুগযুগান্তরের জ্ঞানকর্ম্মের ফল প্রতি দেশে বড় বড় সহরেই সঞ্চিত রয়েছে; তারপর যে উপাদানের সাহায্যে জ্ঞান ও কর্ম্ম বৃদ্ধি লাভ করে, সে উপাদানও ঐ বড় বড় সহরেই সংগৃহীত হয়। একটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করা দরকার। এই নব-শিক্ষার প্রধান অবলম্বন হচ্ছে বস্তু,—বই নয়। নব-বিদ্যালয়ে বইয়ের শিক্ষা ছেলেদের বস্তুজ্ঞানের অনুসরণ করে। এই কারণেই Museum, Zoo, Botanical Gardens প্রভৃতিতে নব-বিদ্যালয়ের ছেলেদের ঘন ঘন যাতায়াত কর্‌তে হয়, এবং বলা বাহুল্য এ সব জিনিস বড় সহরেই থাকে—পাড়াগাঁয়ে থাকে না। তারপর নব-শিক্ষকের দল, ছেলেদের ভাল ছবি দেখানো এবং কনসার্ট শোনানো তাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান এবং সহৃদয়তার অনুশীলনের জন্য একান্ত

প্রয়োজন মনে করেন, এবং উঁচুদরের ছবি দেখতে হলে, উঁচুদরের গানবাজনা শুনতে হলে, সহর ব্যতীত গত্যন্তর নেই। দেশের বড় বড় বক্তাদের বক্তৃতা শোনাও এঁদের মতে শিক্ষার একটি প্রধান উপায়। ছেলেরা বড় হলে যে-সামাজিক জীবনে প্রবেশ করবে, সেই সামাজিক জীবনের সকল উচ্চ অঙ্গের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই তাদের সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার। ছাপার অক্ষরের ভিতর দিয়ে সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় না। সংক্ষেপে, প্রফেসার ফারিয়ার বক্তব্য এই যে,—একদিকে যেমন সামাজিক জীবনের যত কিছু কদর্য্যতা ও হীনতা সহরে পুঞ্জীভূত হয়েছে, অপর দিকে তেমনি সে জীবনের যত কিছু সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব ঐ সহরেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সুতরাং সহরের পাপ ও কদর্য্যতা থেকে ছেলেদের দূরে রাখবার জন্য ছেলেদের সহরের বাইরে রাখা যেমন দরকার; সভ্যতার মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ করবার জন্য ছেলেদের সহরের সন্নিকটে রাখাও তেমনি দরকার।

আর এক কথা। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, স্বাধীনতাই হচ্ছে নব-বিদ্যালয়ের মূলমন্ত্র। তাই এ শ্রেণীর স্কুলের শাসনতন্ত্র হচ্ছে স্বায়ত্ত শাসন। স্কুলের শাসন সংরক্ষণ সবই ছেলেদের হাতে,—এমন কি ছেলেদের পঞ্চায়তে মাষ্টারদের কোনই স্থান নেই। প্রফেসার ফারিয়া এই ছাত্রশাসনতন্ত্রের লম্বা বর্ণনা করেছেন। সে সব কথা বারান্তরে বল্‌ব। এ ক্ষেত্রে এইটুকু বলা দরকার যে, স্বায়ত্ত শাসন বজায় রাখবার জন্য স্কুলের পক্ষে সহরের কাছ ঘেঁসে থাকা দরকার। কেনাকাটি হাটবাজার ত ছেলেদেরই করতে হয়—তা ছাড়া দরকার পড়লে উকীলের পরামর্শ, এঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ নেওয়া প্রভৃতি প্রাপ্ত

বয়স্ক লোকদের কাজও ছেলেদেরই করতে হয়। সহরের বিরাট কর্ম্মজীবনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, এবেলা ওবেলা তাদের সহরে যাতায়াত করতে হয়। স্কুলের বিষয়কর্ম্মের ভার ছেলেদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য তাদের স্বাবলম্বন শেখানো।

(৪)

এই নব-বিদ্যালয়ের আর একটি নিয়ম আছে, যেটি আমার কাছে ভারি নূতন লাগল। এ স্কুল অবশ্য বোর্ডিং স্কুল, কিন্তু তা হলেও এ স্কুলে সস্ত্রীক হেডমাষ্টার ছাড়া অপর কোনও মাষ্টারকে থাকবার স্থান দেওয়া হয় না। এর প্রথম কারণ, এ স্কুল পরিবারের আদর্শে গড়া। ছেলেরা এ স্কুলে যথার্থই গুরুগৃহে বাস করে, গুরু এবং গুরু-পত্নীই তাদের পিতৃমাতৃস্থানীয়। সংসারে আমরা যেমন এক পরিবারের ভিতর আর এক পরিবারকে স্থান দিতে স্বতঃই নারাজ—কেননা ও দুয়ে ভাল করে খাপ খাওয়ান যায় না; তেমনি এই নব-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা একের বেশী গুরুকে সেখানে স্থান দিতে নারাজ—কেননা, এই পারিবারিক স্কুলে নানা গুরুকে একত্র রাখলে তাদের পরস্পরকে খাপ খাওয়ানো যায় না। প্রফেসার ফারিয়া বলেন, পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার ফলেই তিনি এই নিয়ম করতে বাধ্য হয়েছেন। একাধিক মাষ্টারকে একান্নবর্ত্তী করবার ফলে দুটি একটি নব-বিদ্যালয় ভেঙ্গে গেছে। অনেক সন্ন্যাসীতে যে গাজন নষ্ট হয়—এ হচ্ছে তাঁর কাছে পরীক্ষিত সত্য। তাঁর বিশ্বাস পাঁচটি মাষ্টারকে একত্র রাখলে তাঁদের ভিতর দলাদলির সৃষ্টি হতে বাধ্য। এ বিষয়ে

ভাললোক মন্দলোকের কোন কথা নেই। মানুষ যতই ভাল হোক না, তার ধাত বলে একটা জিনিস আছে—এবং অনেক স্থলে মতে মিললেও, পাঁচজনের ধাতে মেলে না। এবং পাঁচজনে যত কাছাকাছি যত ঘেঁসাঘেঁসি করে থাকে, তাদের পরস্পরের ধাতু-বৈষম্য তত ফুটে ওঠে। প্রফেসার ফারিয়া বলেন—যে ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিদ্বেষ প্রকাশ্য-বিরোধে না দাঁড়ায়, সে ক্ষেত্রে তা প্রচ্ছন্ন অবস্থায়ই থাকে এবং প্রচ্ছন্ন বিষের মত তা অলক্ষিতে স্কুলদেহকে জর্জ্জরিত করে। এই কারণে স্বয়ং প্রফেসার ফারিয়া ব্যতীত তাঁর স্কুলের সকল মাষ্টারই ব্রাসেল্‌সে বাস করতেন—অতএব ব্রাসেল্‌স্ হাতের গোড়ায় না থাকলে এ স্কুল চলত না।

যদি বলেন, যে-গাঁয়ে স্কুল সেই গাঁয়েই মাষ্টারদের আলাদা বাসা করে দিলেই ত হত, ব্রাসেল্‌স্ পাঠাবার কি দরকার ছিল?—তার উত্তর, তাঁর নব-বিদ্যালয় ক্রোরপতির স্কুল নয়। এঁদের নব-শিক্ষা-পদ্ধতি কার্য্যে পরিণত করবার জন্য নব-বিদ্যালয়ে বহু মাষ্টার এবং অতি উঁচুদরের মাষ্টার চাই—কেননা প্রফেসার ফারিয়া বলেন, স্কুলের ভালমন্দ, যারা চালায় তাদেরই উপর নির্ভর করে, নিয়মাবলীর উপর নয়। তাঁর ৩২টি ছেলের স্কুলে ১৭টি মাষ্টার ছিল, এবং এঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিষয়ে এক একটি গণ্যমান্য ব্যক্তি। স্কুলের তহবিলে লাখ দুলাখ টাকা না থাকলে এ দরের মাষ্টারদের সব বাঁধা মাইনের চাকর করে রাখা যায় না। এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই ব্রাসেল্‌স্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। হপ্তায় একদিন আধদিন এসে এঁরা ছেলেদের শিক্ষা দিয়ে যেতেন। এ কাজ তাঁরা আহ্লাদের সঙ্গেই করতেন, কেননা সহরে ছদিন সকাল সন্ধ্যে কাজ করে একদিন গাছ-

পালা ফুলফলের দেশে গিয়ে দিনমান ছোট ছেলেদের নিয়ে কাটানতে এঁরা অতিশয় আনন্দ বোধ কর্‌তেন। এই পালায় পালায় পড়ানতে স্কুলের কোনই ক্ষতি হত না; কেননা নব-বিদ্যালয়ে এক-দিনে পাঁচ বিষয় পড়াবার নিয়ম নেই। একদিনে একটি, বড় জোর দুটি বিষয় পড়ানো হয়, তার বেশী নয়।

আজ এই পর্য্যন্ত। ক্রমে অবসর মত, এই নব-বিদ্যালয়ের সবিশেষ পরিচয় দেব।

রাঁচি
১০।১১।১৭

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

গুরু।

—:০:—

"অচলায়তন" নাটক হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছে, অনেকের এইরূপ ধারণা। এ দেশের দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় কিছুদিন ধরিয়া এ সম্বন্ধে যে ভাবে আলোচনা চলিয়াছিল, তাহাতে লোকের এরূপ ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নহে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে নাট্যকলার আজও কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। বড় নাটক অভিনয় করিবার মত অভিনেতা দেশে দুর্লভ। উপযুক্ত দর্শকও সুলভ নয়। কাজেই নাটকের যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারার যা প্রধান সহায়, অভিনয়, তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত আছি। কাজেই সম্প্রতি অচলায়তনকে কিছু সংক্ষিপ্ত করিয়া 'বিচিত্রা' ক্লাবে "গুরু" নাম দিয়া অভিনয়ের যে উদ্যোগ হইতেছে, তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোঝা যায়—ইহার নাম "গুরু" হওয়াই উচিত—"অচলায়তন" ইহার negative দিকের নাম।

গুরু বলিলে কি বোঝায়—তাঁহার কর্ম্ম কি? তিনি বাহির হইতে যে কিছু আনিয়া দেন তাহা নহে, আমাদের মধ্যে যাহা অব্যক্ত হইয়া আছে তাহাকেই তিনি বাহির করিয়া আনেন। মানবের অন্তরে যে অগ্নি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, গুরু নিজের প্রাণের অগ্নিশিখার স্পর্শে

তাহাকে প্রদীপ্ত করিয়া দেন। আমাদের মধ্যে যে অগ্নি নিস্তেজ হইয়া আছে তাহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া দিবার জন্য, গুরুর প্রয়োজন।

চারিদিকের বস্তুপুঞ্জ আমাদের নীচের দিকে টানে। প্রাণ আপনার ভিতর আহুতি দিয়া 'টিস্যু' পুড়াইয়া শরীরকে উত্তপ্ত রাখিতেছে—নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে তাহার অনবরত চেষ্টা, বহির্জগতের যে একটি চাপ আছে, যাহার চেষ্টা তাহাকে বিধ্বস্ত করা, তাহার বিরুদ্ধে নিজেকে খাড়া রাখা। পৃথিবী আমাদের টানিতেছে শোয়াইয়া দিবার জন্য। আমরা যে খাড়া হইয়া আছি, চলিতেছি, সে প্রাণের জোরে। নিশ্চেষ্ট হওয়া কি না, সমস্ত জড়ের সহিত মিলিয়া যাওয়া।

জড়জগৎ বৃহৎ, আমরা ক্ষুদ্র। সুতরাং জড়ের সঙ্গে প্রাণের এই জোঝাজুঝি একান্ত কষ্টকর। যে প্রচণ্ড শক্তি নিশ্চেষ্টতার দিকে টানিতেছে তাহার কাছে আপনাকে ছাড়িয়া দিলে বিশ্রাম পাই। মাটিতে শয়ন করি, তাহাতে আমাদের আরাম হয়।

প্রাণের ধর্ম্ম ইহার উল্টা। প্রাণ আপনাকে স্বীয় শক্তির দ্বারা নিশ্চেষ্টতা হইতে নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। শিখার ধর্ম্ম এ নহে যে একবার তাহাকে জ্বালাইয়া দেওয়া হইল, আর সব হইয়া গেল; নিত্য নিয়তই তাহাকে চেষ্টার দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিতে হয়, তাহার সেই চেষ্টাই আলোক, তাহাই জ্যোতিরূপে আমাদের কাছে প্রকাশমান। কেবলি পুড়িতেছে, চলিতেছে, বাড়িতেছে, উঠিতেছে—বিপুল জড়-জগতের মধ্য হইতে নিজেকে উদ্ধার করিতেছে—এই প্রকাণ্ড উদ্যম, ইহাই প্রাণ।

এই যুদ্ধে প্রাণ এক একবার পরাভবের দিকে যায়। আগুনও জ্বলিতে জ্বলিতে বারবার পরাভবের দিকে যায়। যে ব্যক্তি তাহার উপরকার

ছাই ঝরাইয়া দেয়, সে ত নূতন কিছু দেয় না, সে ভিতরের আগুনকে বাহির করিয়া আনে মাত্র। আত্মার প্রাণশক্তি যখন আরামের ছাই চাপা পড়ে, তখন সেই আরামকে দূর করিবার জন্য আসেন গুরু। ইন্ধন আপনাকে জ্বালাইয়া রাখিবার জন্য যদি চেষ্টা না করে, তবে তা নিবিয়া যায়। নিবিয়া যাওয়াটাই সহজ অবস্থা, আরামের অবস্থা।

গুরু মানুষই হউন, আর দেবতাই হউন, ঘা দিয়া দুঃখ দিয়া, আমাদের ভিতরকার যে তেজ ম্লান হইয়া আসিতেছিল তাহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া দেন। আধ্যাত্মিক প্রদীপটি যাহাদের অন্তরে ম্লান হইয়া যাইতেছিল, তাহারা সেই গুরুর অপেক্ষা, জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে করিতে ছিল—যিনি খোঁচাদিয়া, আঘাত করিয়া তাহাকে জ্বালাইয়া তোলেন।

চেষ্টার অভাবই জড়তা, প্রাণ মানুষের ভিতরের স্বতঃচেষ্টা। কিন্তু সব বিষয়ে, নব নব চেষ্টার সাহায্যে যদি প্রাণকে টিঁকিয়া থাকিতে হয়, তাতে ব্যাপার বড় কঠিন হয়। আমাদের প্রতিদিনই যদি খড়কুটা দিয়া ঘর তৈয়ারি করিতে হইত, শয়ন করিতে হইলে তুলা ধুনিয়া তোষক প্রস্তুত করিতে হইত, তৃষ্ণা পাইলেই কূপ খনন করিতে হইত, তাহা হইলে অবশ্য মনে হইতে পারিত, প্রাণের ক্রিয়া খুব প্রবলভাবে চলিতেছে। কিন্তু এ-অবস্থা চলতে পারে না। প্রাণের ধর্ম্ম নিয়ত চলা কিন্তু আমাদের শক্তি পরিমিত বলিয়া সে শক্তিকে আমাদের বাঁচাইয়া চলিতে হয়। পলিতা যদি আগাগোড়া জ্বলে তবে তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। প্রদীপ ততটুকুই জ্বলে যাহাতে আলো হয়, যাহা না জ্বলিলে তাহার চলে না। প্রাণ তেমনিই ব্যবস্থার দ্বারা শক্তির অতিব্যয় নিবারণ করে।

এমনি করিয়া সমাজে প্রথা জিনিসটির উৎপত্তি হইয়াছে। প্রত্যেক-বার আমাদের যদি ভাবিতে হইত, দেখা হইলে গুরুজনদের সঙ্গে কি ব্যবহার করিব– শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য কোনও দিন ডিগবাজী খাইলাম কোনও দিন বা জিহ্বা বাহির করিলাম—তবে বড়ই মুস্কিল হইত। তাই বাঁধা নিয়ম হইল প্রণাম করা। মানুষ বাড়ী তৈয়ারি করিয়া রাখিয়া দেয়, পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগদখলের জন্য। শক্তির অপব্যয় নিবারণের জন্য প্রাণকে এইরূপ নিয়ম বাঁধিয়া দিতে হইয়াছে, অর্থাৎ সামাজিক কল গড়িতে হইয়াছে।

সামাজিক বিষয়ে যত কিছু তর্ক সে হইতেছে—জড়ের সহিত কারবারে, কলবস্তুকে যতটা স্বীকার করিয়াছি, তাহার পরিমাণ উচিত কি না, এই লইয়া। আপনার ভিতর হইতে যে চেষ্টা, প্রাণ, সেই চেষ্টাকে তুমি কত দূর মানিবে, এই লইয়া তর্ক। প্রাণকে যদি বড় জায়গাতেও ঘুম পাড়াইয়া রাখি, সকল জায়গাতেই যদি বাঁধা নিয়মে চলি, তবে চলাই হয় না। যে জাতি সুদূর অতীতের লোকাচার, দেশাচার, মনু পরাশর, এইসকলের উপর সব বিষয়ের বরাত দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, সে নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় তামসিক হইয়া যায়, তাহার অধঃপতন কে ঠেকাইবে!

আমাদের সব বাঁধা, এমন কি ধর্ম্ম এবং আচারও বাঁধা হইয়া গিয়াছে। আমরা নিজে যাহা কিছু করিতে পারিতাম, তাহার বরাত দেওয়া রহিল, সংহিতা স্মৃতির উপর। আমার চলায় প্রয়োজন নাই —এক জায়গায় ঘানির মত ঘোরাই হইল আমার চলা! নিয়ম যখন অতিরিক্ত হইয়া উঠে, তখন প্রাণের সার্থকতা চলিয়া যায়। মানুষ তখন ভস্মাচ্ছন্ন আগুনের মত হইয়া উঠে। সে যখন জড়ের সহিত,

আপনার আশপাশের সহিত, বনিবনাও করিয়া চলিতে চায়, তখন তাহার চলার পথে বাধা আসে।

গুরু আপনার প্রচুর প্রাণশক্তি লইয়া আসেন, এই বাধা দূর করিয়া দিবার জন্য।

অতএব "অচলায়তনের" অর্থ সুস্পষ্ট। ইতিপূর্ব্বের "রাজা" নাটকে ব্যক্তিবিশেষের কথা ছিল—"সুদর্শনা" কি করিয়া অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া আসিল। "অচলায়তন" সমাজের কথা, অনেকের কথা।

এইখানেই সমস্যা। পরস্পরের সহিত পরস্পরের যোগ যেখানে বিচিত্র সেখানে প্রত্যেকের জন্য নূতন করিয়া ভাবা সম্ভব নহে। মানুষের প্রয়োজন বশতঃই মানুষকে সামাজিক কল তৈয়ারি করিতে হইয়াছে।

আমাদের সুবিধা হয় বলিয়া যদি প্রাণের সব কাজের ভার কলের উপর দিই, তাহা হইলে যাহার কাজ দাসত্ব করা, সে হয় প্রভু। ইতিহাসে দেখা যায় রোমকেরা যখন তাহাদের দাসদের উপর সব কাজের বরাত দিতে লাগিল, তখন তাহারা তাহাদের হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিল। বড় বড় সমাজের পতন এমন করিয়াই হয়। সমাজের যখন অবনতি হয় তখন সে কল অর্থাৎ organisation-এর উপর সব বরাত দেয়। তাহার তেজ যত মরে, বল যতই কমে, সে ততই কলের উপর বরাত দিয়া নিজের শক্তি বাঁচাইতে চায়। হয়ত ভারতবর্ষও এই কাজ করিয়াছে। যতই তাহার দুর্গতি ঘনাইয়া আসিয়াছে, ততই কলের উপর বরাত দিয়া প্রাণশক্তিকে সে নিশ্চেষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করিবার দিকেই প্রাণের উদ্যম, এবং তাহাতেই তাহার আত্মরক্ষা। ছোট ছেলে চেঁচাইবে, কাঁদিবে, দৌড়াইবে, এ তাহার পক্ষে ভাল। কিন্তু ধাত্রীর পক্ষে ইহা বিষম অসুবিধা জনক। ধাত্রী সেইজন্য কখন কখনও আফিম খাওয়াইয়া ছেলেকে ঝিমাইয়া রাখে। যাহারা পরের ভার লয়, ইহাতে তাহাদের খুবই সুবিধা। সমাজের ধাত্রী দেখে, যেখানে প্রাণ প্রবল, সেখানে নিয়ম শাসনের ব্যতিক্রম ঘটে। কাজেই তাহাদের কসিয়া বাঁধিয়া, কিম্বা আফিমের ড্যালা খাওয়াইয়া নিস্তেজ করিয়া রাখিতে তাহার চেষ্টা হয়। বৌদ্ধ যুগের সময় হয়ত এদেশে প্রাণের একটু চাঞ্চল্য আসিয়াছিল—তাহার পর আমাদের রঘুনন্দনের দল সমাজকে আচারের বড় একটি আফিমের ড্যালা খাওয়াইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কোনও বিধির কারণ জিজ্ঞাসা করিবে না, কিন্তু উত্তর শিয়রে শুইবে না; পশ্চিমে বসিবে না ইত্যাদি। আমাদের দুর্গতির হয়ত এ এক কারণ। অথবা হয়ত পোলিটিক্যাল কারণে আমরা দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিলাম—এবং ক্লান্ত মানুষকে শোয়ান সহজ; যে সবল, যাহার তেজ আছে, তাহাকে পাড়িয়া ফেলা সহজ নহে। তাই রঘুনন্দনের দল যখন চিন্তা না করা, দ্বিধা না করার মশারিঘেরা বিছানা করিয়া দিলেন, তখন শুইয়া পড়িলাম। হয় প্রাণ আপনিই নিশ্চেষ্ট হইয়া আসিয়াছিল বলিয়া ইহা ঘটিল, নচেৎ কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে কমানো দরকার মনে করিয়াছিলেন বলিয়া এইরূপ হইল।

গুরুর কাজ হইতেছে, কল যত আরাম দিক্, তাহার হাত হইতে মানুষকে উদ্ধার করা। তিনি জানেন, সচেতন প্রাণই বল, জড়ের কাছে সে যেখানে জয়ী, সেইখানেই তাহার সার্থকতা, তাই যথার্থ গুরু

বিপ্লবকে বহন করিয়া আসেন। লোকে তাঁহাকে শত্রু বলিয়া জ্ঞান করে। লোকে মনে করে বাঁধা মন্ত্র যিনি কানে দেন, তিনিই গুরু। কিন্তু মানবের গুরু রুদ্ধদ্বার ভাঙ্গিয়া, বিপ্লবের বাহনে আসেন—তিনি সেই কথা বলিতে আসেন যাহা আমরা সহজে মানিব না, শুনিব না। গুরু আসা গুরুতর ব্যাপার। বিধাতা যখন আমাদের প্রার্থনা শোনেন "যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব" যা ভদ্র তাই দাও—তখন তিনি দুই হাতে মশাল লইয়া আসেন—বড় ভয়ানক সে কাল! যিনি বলিয়াছেন "যুগে যুগে সম্ভবামি" তিনি যখন আসেন, তখন দেশে দেশে হাহাকার পড়িয়া যায়, সেদিন দারুণ দুঃখের দিন! তাঁহারও অপমানের দুঃখের শেষ নাই। যখন আরামে আছি, তখন যে আরাম ভাঙ্গিতে আসে তাহাকে লাঞ্ছিত হইতেই হয়।

প্রাণ নিজেকে আঁকড়াইয়া থাকে—'মমি'র সঙ্গে যে বীজ ছিল, ৩।৪ হাজার বৎসর পরেও অনুকূল অবস্থার মধ্যে পড়িবামাত্র তাহা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল! মানুষের ভিতর যে প্রাণশক্তি আছে তাহাও সহজে মরিতে চায় না। বাঁধা নিয়মের দাসত্ব করিতে করিতে, বিশ্বের সহিত অব্যবহিত ভাবে আনন্দের যে যোগ, তাহা পাইবার ব্যাকুলতা সমাজের অন্তরে মরিয়া যায়—তবুও তাহার মধ্যে এক একজন থাকিয়া যায়, প্রত্যক্ষ ভাবে নিজের প্রাণকে সকলের সঙ্গে যোগযুক্ত করিবার ব্যথা যাহাদের কিছুতে মরে না। 'পঞ্চক সেই ব্যক্তি—যাহার প্রাণ মরিয়াও মরিতে চাহে না, চতুর্দ্দিক হইতে পিষ্ট হইয়াও যে বাঁচিয়া থাকে। "অচলায়তন" তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না—মন্ত্র আওড়াইতে গিয়া তাহার মুখ হইতে গান বাহির হইয়া পড়ে।

সমাজে যখন এই শ্রেণীর দুই একটি মানুষ দেখা দেয় তখনই বুঝিতে হইবে, গুরুর আগমনের পথ প্রস্তুত হইতেছে। দেশে যখন, এমন সকল লোক উঠিতে থাকেন যাঁহারা বলেন "আমি বাঁধা মত মানিব না, কিন্তু আমার ভিতর যে বিচার বুদ্ধি আছে তাহাকে মানিব" তখন বুঝিতে হইবে গুরু অসিহস্তে আসিতেছেন—দশের চিত্তের চাঞ্চল্য, প্রাণের বেদনা, তাহারই আভাস দেয়। হঠাৎ একটা স্থলে দরজা খোলে, প্রাণবায়ুর স্পর্শে সকলের চিত্ত অল্পে অল্পে দোদুল্যমান হইতে থাকে। ক্রমে গুরু আসেন।

গ্রীষ্মে সব শুকাইয়া গিয়াছে। নিজের ভিতর হইতে জোগাইবার রস আর নাই—সব তলানিতে গিয়া ঠেকিয়াছে। তখন সমস্ত বিশ্ব ব্যাকুল হইয়া বলিতে থাকে 'এস' 'এস'! অমনি গুরু আসেন তাঁহার বজ্র লইয়া, বিদ্যুৎ লইয়া। সরসতায় তিনি আকাশ ভরিয়া দেন। যাহারা মরিয়াছিল তাহারা বাঁচিয়া ওঠে, পীতবর্ণ শ্যামল হইয়া ওঠে, জরা নবীন যৌবনে পরিণত হয়। এই ঘটনা মানুষের জীবনের মধ্যেও দেখিতে পাই। সমাজ যখন কল, ধর্ম্ম যখন আচার-মাত্র, তখন সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া আসেন গুরু। প্রাচীর নীচের—চিত্ত আকাশ ভরিয়া যখন পূর্ণতার ঋতু আসেন, তখন তাহাকে ঠেকাইবে কে, তাহার ত কোনও সীমা নাই!

লোহার দরজায় ঘা দিতে দিতে মনে হয়, বৃথা এই চেষ্টা। রুদ্ধ দরজাকে মুষ্টি আঘাত করিয়া হস্ত শুধু রক্তাক্ত হইতে থাকে। চেষ্টা অবশ্য জীবনের একটা লক্ষণ। কিন্তু এখানে ঠেলিয়া, ওখানে ভাঙ্গিয়া কিছু করা বড় শক্ত। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বড়, তাঁহারা গলা ভাঙ্গিয়া মরিলেন, কিন্তু দরজা একটু ফাঁক করা আর হইয়া উঠিতেছে না। আকাশ

ভরা পূর্ণতা লইয়া গুরু আসুন—পড়ুক আকাশ ভাঙ্গিয়া বজ্র—সব এক মুহূর্ত্তে ঠিক হইয়া যাইবে। অনেক দিনের এই দুর্গ, মন ইহাকে মানিতে চায়, বুদ্ধিকে ইহা আছন্ন করে। পুনরাবৃত্তির পথে ঠুলি দেওয়া গরুর মত চলিয়াছি, এই দুর্গতি হইতে বাঁচাইবার কান্না কবে উঠিবে!

আমাদের জীবনে নিশ্চেষ্টতা সবদিক হইতে আমাদের আক্রমণ করিয়াছে। প্রাণশক্তি কমিয়া আসিয়াছে, কাঁটা ফুটিলে তাহা যে বিষাক্ত ক্ষত হইয়া দাঁড়াইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

গোড়ায় যে প্রাণশক্তিকে নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি, সেখানে যখন জোয়ার আসিবে তখনই সব সার্থক হইবে। মূলে, অধ্যাত্মিক জীবনে, প্রচুর প্রাণধারা বর্ষণ করিয়া গুরু আমাদের রক্ষা করিবেন। হাজার রূপ ধরিয়া তিনি আসিবেন। হৃদয়ে হৃদয়ে তিনি বাস করিতেছেন—"বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা"—তিনি মহাত্মা, সকলের আত্মার মধ্যে তিনি কাজ করিতেছেন, সকল মনুষ্যের মধ্যে তিনি "নিবিষ্টঃ।" তিনি যখন আসেন তখন আত্মায় আত্মায় জাগরণের মন্ত্র উচ্চারিত হয়,—একাজ কোনও একজনের সাধ্য নহে। বসন্ত ঋতুর মত সব দিক দিয়া সকলকে তিনি পত্রপুষ্পে ভরিয়া দেন, বর্ষার মত সমস্ত তিনি প্লাবিত করিয়া দেন। ইহাই 'অচলায়তনের' বাণী।

শ্রীসন্তোষ চন্দ্র মজুমদার।

নববর্ষ।

—:০:—

নূতনপন্থীদের বিরুদ্ধে পুরাতনপন্থীদের তরফ থেকে এই একটা প্রকাণ্ড অপবাদ ক্রমাগত আসে যে, তারা প্রাচীনের আদর জানে না; এ অপবাদ বড় কম অপবাদ নয়। প্রাচীনই ত সত্য, সেই ত আবহমান কাল থেকে চলে আসছে, এবং সেইই ত সৃষ্টির শেষদিন অবধি সমস্ত বাধাকে তফাতে ঠেলে দিয়ে সজোরে দাঁড়িয়ে থাকবে। এত বড় সত্য যস্মিন পক্ষে, তস্মিন পক্ষে জনার্দ্দন না থেকে যে যেতে পারে না, সে কথা নূতনপন্থীদের অবিদিত নেই। তবু তারা নূতনকে এত করে চায় কেন?—সকল অকাট্য যুক্তির সমস্ত আটক ভেঙ্গে নূতনত্বের বাণ যে আজ আমাদের মধ্যে ভীষণভাবে গর্জ্জে উঠেছে,—সমস্ত ভেঙ্গে চুরমার করে দেবার জন্যে,—আর চোখের সুমুখে প্রতিদণ্ডে যে তার জলোচ্ছ্বাস মাটির বাঁধের প্রত্যেক পরমাণুকে কাঁপিয়ে তুলছে, একি তবে সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড একটা?—না, তা নয়।

জগতে তারাই তত সংরক্ষণশীল, যারা নূতনকে যত বেশী কমে আমল দেয়; আর তারাই সকলের চেয়ে পুরাতনকে চাইতে শিখেছে, যারা প্রতিক্ষণে তাদের সাদর অভ্যর্থনার রঙীণ নিশান আর দেবদারুর সবুজ পত্র সজ্জিত করে রেখেছে, নিত্যনূতনকে আদর করে গ্রহণ করবার জন্যে। হে নববর্ষ, প্রাচীনের উপাসক আমরা তাই তোমাকে সাদরে আহ্বান করছি—তুমি এস!

কোনও প্রাচীন ব্যক্তি ৯০ বৎসর বয়সে এমন একটা রোগের দ্বারা আক্রান্ত হন যার নাম তিনি জীবনে কখন শোনেন নি, এবং সেই একই কারণে সে রোগের ঔষধের কোন তল্লাস তিনি সমস্ত বৈদ্যশাস্ত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পান নি। কোন আধুনিক ডাক্তার তাঁর জন্যে ইংরেজী ঔষধের ব্যবস্থা করায় তিনি বলেছিলেন, "বাপু হে! আজকালকার ওষুধগুলো দিয়ে আমার প্রাচীনত্ব নষ্ট কোরো না"; তাইতে আধুনিক ডাক্তারটি উত্তর করেন,—"মশাই, আপনার প্রাচীনত্ব যাতে আরো পাকা হতে পারে, অর্থাৎ আরও দশ বছর বেঁচে থেকে আপনি যাতে মরবার সময় বলে যেতে পারেন যে পুরোপুরি century up করেছি, তারি বন্দোবস্ত করছি। আমার নতুন ওষুধ আপনার প্রাচীনত্বকে আরো প্রাচীন হবার অবসর দিচ্ছে মাত্র—নষ্ট করছে না।" আমরাও প্রাচীনপন্থীদের ডাক্তারবাবুর মত করে ভরসা দিচ্ছি, তাঁদের পুরাতন যাতে আনাভি-শুভ্র-শ্মশ্রুরাজী পরিশোভিত হয়ে যুগ যুগ ধরে আপনাকে পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে পুরাতন হতে পুরাতনতর করে তুলতে পারে, তারি চেষ্টা করছি। আর সেইজন্যেই পুরাতনের রাজদরবারে নূতনের দূতকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এত ঘন ঘন পাঠান হচ্ছে; এতে পুরাতনের রাজত্ব দৃঢ় হয়ে উঠবে, তার শক্তি আরো অক্ষুণ্ণ হবে—এতে ভয়ের কোন কারণ নেই।

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের বলে গেছেন একটা "নতুন কিছু" করতে (অবশ্য ব্যঙ্গ করে)। এখানে "নতুন কিছু" অর্থে সৃষ্টিছাড়া কিছু, অর্থাৎ যা জগতের কোন-কিছুর সঙ্গে খাপ খায় না—একটা খাপছাড়া কিছু। আমাদের নূতন অবশ্য আদবেই তা নয়, বরং

আমার বোধ হয় এ জগতে কিছু যদি খাপছাড়া বদনামের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে ত সে আমাদেরই ঐ নূতন। সেই ত পুরাতনকে বর্ত্তমানের সঙ্গে তাল রেখে চলবার ক্রমাগত সাহায্য করে আসছে; সেই ত কালকের জগতকে আজকের জগতের সমস্ত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পা ফেলে চলতে, হাত ধরে শিখিয়ে দিচ্ছে; সেই ত তাকে প্রতিক্ষণে খাপছাড়া হতে দিচ্ছে না। সমস্ত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে আজও তাকে সৃষ্টিছাড়া হবার সমস্ত আশঙ্কা, সমস্ত সম্ভাবনার হাত হতে, সেই ত মা'র মত করে আগ্‌লে রেখে দিয়েছে। তাই আমরা আজ প্রাচীনের জীর্ণ দেউলের সর্ব্বোচ্চ পৈঠার উপর দাঁড়িয়ে নবীনকে সাদরে আহ্বান করছি, আমাদের প্রাচীনকে মহিমান্বিত করে তোল-বার জন্যে। হে নবীন! তুমিই ত প্রাচীনের সমস্ত তালুক মুলুক আজ পর্য্যন্ত সমান ভাবে রক্ষা করে আসছো, বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর মত। তুমিই ত প্রাচীনকে আজও নিঃস্ব হবার সমস্ত সম্ভাবনা হতে বাঁচিয়ে রেখেছ, তাই তোমার উপাসক আমরা নিজেদের সকলের চেয়ে সংরক্ষণবাদী বলে গর্ব্ব করে থাকি। তাই তোমাকে যারা ভালবাসে, তাদের আমরা সকলের চেয়ে প্রাচীন-ভক্ত বলে শ্রদ্ধা করি।

নবীনের ঐ সূক্ষ্ম গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে কত বড় প্রাচানতার গাম্ভীর্য্য যে লুকিয়ে রয়েছে, তা যদি সকলে দেখতে পেতো, তাহলে নবীনের জন্যে ঘরে ঘরে উৎসব জেগে উঠতো, তার আগমনের পথ কুসুমাস্তৃত হয়ে উঠতো।

যা অপরিচিত তাইত নূতন, যাকে চিনতে যত বেশী দেরি হয় সে তত বেশী নূতন; আর পুরাতন সেই, যাকে দেখলেই চিনতে পারি। আজকের এই যুগে আমরা কি চিনিনা বেশী করে জাতিভেদ-বিদ্বেষকে

জাতিভেদ-প্রিয়তার চেয়ে? আমরা কি চিনিনা, বিধবাবিবাহকে একাদশী-তত্ত্বের গূঢ়তার চেয়ে? আমরা কি চিনিনা বঙ্কিম বাবুকে তর্কপঞ্চাননের মুণ্ডিতমস্তকপরিশোভিত বিশাল বপুর চেয়ে? এরাই কি আমাদের হৃদয়ের সমস্ত অর্গল একে একে খুলে দিয়ে একেবারে তার অন্তস্তলে অতি বড় পরিচিতের মত প্রবেশ করেনি? আর অন্যগুলো বাইরে রাজপথে দাঁড়িয়ে কড়া নেড়ে নেড়ে একে একে ফিরে যাচ্ছে নাকি?—তবে পুরাতন কে? হে নবীন! তুমিই পুরাতন। তুমিই ত প্রতিক্ষণে যা-কিছু নূতন আছে তাকে আমাদের কাছে পুরাতন করে তুলছো; তুমিই ত যা-কিছু অপরিচিত তাকে পরিচিত করে তুলছো। হে নববর্ষ! তাই তোমাকে প্রাচীনের তরফ থেকে অভিনন্দন দিচ্ছি, তুমি গ্রহণ কর। হে প্রাচীন! হে চিরন্তন! তোমার আগমনী তাই আজ আকুল কণ্ঠে গাইছি; তোমার পূজার অর্ঘ্য তাই এত ভক্তি এত শ্রদ্ধার সঙ্গে রচনা করছি—তুমি এস। তোমার আগমনে সমস্ত দেশ জেগে উঠুক,—তন্দ্রা টুটে, আলস্য অবসাদ জড়তা দূরে ঠেলে দিয়ে।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

পত্র।

—:০:—

শ্রীমান চিরকিশোর

কল্যাণীয়েষু,—

তুমি যে আমার প্রিয়শিষ্য, লোকে বলে তার প্রধান কারণ—তোমার রূপ আছে। তোমার প্রতি আমার প্রীতির প্রধান কারণ ঐ না হলেও যে প্রথম কারণ, এ কথা অস্বীকার করা আমি মোটেই আবশ্যক মনে করিনে। আমি জীবনের অর্দ্ধেকের চাইতে বেশী পথ পার হয়ে এসেছি, এবং চোখ চেয়ে চলা আমার চিরদিনের অভ্যাস। কিন্তু এত দিনেও পথিমধ্যে এ সত্যের আমি সাক্ষাৎ পাই নি যে, রূপের অভাবেই গুণের পরিচয়। রূপ যে একটা গুণ, এবং অসামান্য গুণ—এ কথা অস্বীকার করবার জন্য এত লোক যে কেন এত উৎসুক, তার সন্ধান আমি আজও পেলুম না। রূপ হচ্ছে বিধাতার নিজের হাতের লেখা পরিচয়পত্র,—তা সে জড়েরই হোক, আর জীবেরই হোক। শুধু তাই নয়, ও পত্র হচ্ছে, ইংরাজিতে যাকে বলে খোলা-চিঠি। ভগবান বিশ্বমানবের চোখের সুমুখে তা ধরে দিয়েছেন—সে সুপারিস অগ্রাহ্য করার ভিতর বিনয় নেই, বিচার নেই,—আছে শুধু হয় অন্ধতা নয় পরশ্রীকাতরতা।

দাঁড়াও, এ কথা শুনে একেবারে উৎফুল্ল হয়ে উঠো না। ভগবান মানুষকে যা দিয়েছেন, তার যথেষ্ট মর্য্যাদা থাকলেও—মানুষ নিজে যা

দিতে পারে, মানুষের কাছে তার মূল্য ঢের বেশী। রূপ শুধু পূর্ব্ব-রাগের জন্ম দেয়, কিন্তু যে সব কারণে সে রাগ অনুরাগে পরিণত হয়, তার সংখ্যা অসংখ্য; কেননা এ ক্ষেত্রে মানুষের প্রবৃত্তির চাইতে তার প্রকৃতি প্রবল। প্রবৃত্তি মুহূর্ত্তের, প্রকৃতি চিরদিনের। তুমি যে আমার প্রিয়শিষ্য, তার বিশেষ কারণ, তুমি একাধারে আমার শিষ্য ও গুরু। কথাটা একটু নতুন শোনাচ্ছে। কিন্তু তা বলে কি করা যাবে? কথাটা যে সত্য! সত্যকথা ত চিরদিনই নতুন শোনায়। সত্যের ধর্ম্মই ত এই যে, তা কখনও পুরোণো হয় না, কিন্তু মানুষকে তা যুগে যুগে নতুন করে চিন্‌তে হয়। এই নিয়েই ত যত মুস্কিল। সে যাই হো'ক্, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ যে মনের কারবারে পরস্পরের আদান প্রদানের সম্বন্ধ, এ ব্যাপার এতই প্রত্যক্ষ যে, তা কাউকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার দরকার নেই। গুরু যদি হন শুধু বক্তা, আর শিষ্য শুধু শ্রোতা—তাহলে পৃথিবীতে গ্রামোফোনের তুল্য আর দ্বিতীয় গুরু নেই। যদি পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ থাকে যেখানে গুরু কালা আর শিষ্য বোবা, তাহলে আর যিনিই হন, তুমি আমি সে দেশের লোক নই। কে কার কাছ থেকে মনের খোরাক কতটা আদায় কর্‌তে পারে, এই নিয়ে যেখানে পরস্পরের রেষারেষি জেগে ওঠে, সেইখানেই গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ পাকা। তুমি তর্ক করে, প্রতিবাদ করে, আপত্তি জানিয়ে, উপদেশ দিয়ে আমাকে অস্থির করে তোলো,—এই গুণেই ত তুমি আমার প্রিয়শিষ্য।

তুমি আমাকে প্রবন্ধ লেখা থেকে ক্ষান্ত হতে অনুরোধ করেছ। এ অনুরোধ আমি আদেশ হিসেবে শিরোধার্য্য কর্‌ছি। আমার মনেও কিছুকাল হতে প্রবন্ধের প্রতি বিরতি জন্মেছে। তার কারণ

প্রবন্ধ জিনিসটে সাহিত্য কিনা, এই নিয়ে আমি এদানিক মাথা বকাচ্ছিলুম, কিন্তু কোনও একটা স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি নি; এমন সময়ে তোমার একটি কথায় আমার সকল দ্বিধা দূর করে দিলে। তুমি লিখেছ—"প্রবন্ধ স্ত্রীলোকে পড়ে না, পড়তে চায় না, পড়তে পারে না এবং পড়লে কাতর হয়ে পড়ে।"

এ কথা যে সত্য, তা অস্বীকার কর্‌বার জো নেই। প্রবন্ধ জিনিসটি জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার ছাঁচে ঢালাই করা; এবং ইউক্লিড আর যারই হন্—স্ত্রীলোকের প্রিয় লেখক নন। ও-জাতির কাছে আসল বস্তুই হচ্ছে Q. E. D.—তার প্রমাণ-প্রয়োগ যেমন অবান্তর, তেমনি বিরক্তিকর। ভাল কথা, ইউক্লিড সম্বন্ধে সেদিন কোন্ একখানা বইয়ে একটা কথা পড়ছিলুম, যা শুনে তুমি না হেসে থাক্‌তে পার্‌বে না। ও ভদ্রলোক স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করে থাক্‌তেন! এর কারণ শুন্‌লে আরও আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। ইউক্লিড ছিলেন মেগারার অধিবাসী। তখন মেগারার সঙ্গে আথেন্সের ঘোর শত্রুতা চলছিল। মেগারার লোকের আথেন্সে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল, সে নিষেধ অমান্য করে কেউ আথেন্সে দেখা দিলে তার প্রাণদণ্ড হত। ইউক্লিড কিন্তু নিজের প্রাণের চাইতে তাঁর গুরু সক্রেটিসের মুখের কথা এত বেশী বহুমূল্য মনে কর্‌তেন, যে তিনি মেয়ে সেজে রাত্রিযোগে আথেন্সে যাতায়াত কর্‌তেন। তাঁর রূপের গুণে তাঁর ছদ্মবেশ কখনও ধরা পড়ে নি। এমন অভিসারিকার কথা এ দেশে কেউ কখন পড়েছে, না শুনেছে? এর পর তাঁর মন থেকে যে ঐ সব ভীষণ প্রতিজ্ঞা বেরবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! ইউক্লিড নারীবেশই ধারণ করুন আর যাই করুন, যে লেখার ভিতর ইউক্লিডের রূপ আছে, তা মেয়ে-

ভোলানো লেখা নয়। অতএব দাঁড়াল এই যে, প্রবন্ধের স্থান—সাহিত্যের না হোক—বাংলা সাহিত্যের বাইরে। তুমি একটা কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছ, সে হচ্ছে এই যে, আমার প্রবন্ধ এদেশের অনেক পুরুষেও "পড়ে না, পড়্‌তে চায় না, পড়্‌তে পারে না, এবং পড়্‌লে কাতর হয়ে পড়ে"।

এ ক্ষেত্রে প্রবন্ধ কার জন্য লেখা? তার সন্ধান আমি সম্প্রতি পেয়েছি।

কোনও সমালোচক লিখেছেন যে, আমার হাত থেকে যা বেরয় তা হচ্ছে সব "চক্‌চকে খেলনা"। অর্থাৎ আমার লেখা আসলে ছেলে ভোলানো। এই সমালোচনাই প্রমাণ যে আমার লেখা সার্থক হয়েছে—কেননা বাংলাদেশে আমার লেখার খোদ্দেরের অভাব হবে না।

সে যাই হো'ক, তোমার কথায় প্রবন্ধ লেখায় না হয় খতম দিলুম—তারপর কি লিখব? কবিতা? গদ্যের অসি ছেড়ে পদ্যের বাঁশি ধরব? সাহিত্যের স্কুলে এরকম ডবল-প্রমোশান পেতে কার না লোভ হয়, কিন্তু এ বয়েসেও ও-লোভ যে সম্বরণ কর্‌তে না শিখেছে, তার হাত থেকে—অসি বাঁশী ত বড় জিনিস—কলমও কেড়ে নেওয়া উচিত! পঞ্চান্ন বৎসরের লোককেও যে ধরে বেঁধে অসিধারী করা যায়, তার প্রমান ত আজ নানাদেশে পাওয়া-যাচ্ছে। কিন্তু Conscription-এর সাহায্যে মানুষকে যে বংশীধারী করা যায়, এর প্রমাণ আজও মেলে নি। এর কারণ হিংসা করবার ক্ষমতা বুড়োহাড়েও থাকে, কিন্তু আনন্দ দেবার শক্তি যৌবনেরই সহোদর।

দেখো, কে কি লিখবে তার চেয়ে গুরুতর সমস্যা হচ্ছে কে কি পড়বে। তুমি কি পড়ে এই গ্রীষ্মের ছুটি কাটাবে, সে বিষয়ে আমার

পরামর্শ চেয়েছে। আমি বলি, যে লেখার রূপ নেই তা তুমি পড়োনা, হোক না সে লেখা ওজনে ভারি। তুমি যদি রচনার রূপ উপভোগ করতে শেখো, তাহলেই তুমি মনোজগতে মুক্তপুরুষ হয়ে যাবে। চণ্ডীদাস বলেছেন—

"রজকিনীরূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়"

তাঁর কথা অবলম্বন করে' আমি বলছি যে, যে রূপের ভিতর কামগন্ধ নেই, সে রূপের সন্ধান শুধু আর্টে পাওয়া যায়। অবশ্য এ স্থলে "কাম" শব্দ তার কোনও সঙ্কীর্ণ অর্থে বুঝলে চলবে না। যে রূপ মানুষের কামনার বহির্ভূত, সেই রূপ যে চিনতে শিখেছে, একমাত্র সে-ই রসের স্বরূপের সাক্ষাৎ পায়। বলা বাহুল্য একই লেখা এক-জনের কাছে কামগন্ধে ভুরভুর করতে পারে, কিন্তু আর একজনের কাছে তার ভিতর কামের নামগন্ধও না থাকতে পারে। সেটা নির্ভর করে কার মন কোথায় আছে তার উপর—কামলোকে না রূপলোকে?

কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা যে রকম সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাতে করে কি লিখব কি পড়ব তার চেয়ে ঢের বেশী ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে, দেশে আর লেখাপড়া করা চলবে কিনা? এ কথা আমরা সকলেই জানি যে, দেশে যখন মহামারি দেখা দেয়, তখন লোকে পূজো সরস্বতীর করে না, করে রক্ষাকালীর; অর্থাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার মানুষে সহজ উপায় বার করেছে—মৃত্যুরই উপাসনা করা। আত্মরক্ষার এ প্রচেষ্টা নিরর্থক বলে' কোনও লাভ নেই, কেননা, এ চেষ্টার মূলে যা আছে তা হচ্ছে মানুষের প্রতিষ্ঠিতা প্রজ্ঞা নয়,—বিচলিত হৃদয়।

আজ আমাদের পশ্চিম আকাশে রক্তসন্ধ্যা দেখা দিয়েছে। যে সমরানল সমগ্র ইউরোপে ও অর্দ্ধেক এসিয়াতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে; সে আগুন শুনছি আমাদের ঘরেও লাগবার সম্ভাবনা; এবং সে সম্ভাবনাও সুদূর নয়, কেননা যে যুগে বাষ্প আর বিদ্যুৎ হয়েছে মানুষের বাহন, সে যুগে 'দূর' শব্দের কোনও জানা শোনা মানে নেই। এ সকল দুর্নিমিত্ত দেখে আমরা সকলেই ভীত না হয়ে পড়ি, ত্রস্ত হয়ে উঠেছি। তাদৃশ ভীত না হবার কারণ, আমরা আমাদের চিরকেলে অভ্যাসবশত সাপকে লতা বলে' মনকে প্রবোধ দিচ্ছি, যদিচ আমরা সকলেই জানি, লতা বললেও সাপ সাপই থাকে এবং তার কামড়ে মানুষ মরে। আর জর্ম্মাণি যে সে সাপ নয়, একেবারে অজগর।

এ অবস্থায় আমাদের কি কর্ত্তব্য তা বলে দেবার ভার রইল, আমাদের পলিটিকাল নেতাদের হাতে। "যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্যলোকে লাঠি বাজে" এ কথা যদি সত্য হয়—এবং এ কথা যে সত্য তা এক পলিটিসিয়ান ছাড়া আর কে অস্বীকার করবে—তাহলে দেশের লোককে তাদের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হতে, আমাদের নিরস্ত থাকাই শ্রেয়। কেননা সাহিত্যের কাজ, কাউকে কর্ত্তব্য শেখানো নয়, সকলকে আনন্দ দেওয়া।

এ পর্য্যন্ত বোধহয় আমরা সকলেই একমত। তারপর প্রশ্ন ওঠে এ অবস্থায় সরস্বতীর সেবকদের পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য। প্রথমেই মনে হয় এ সমস্যার সহজ মীমাংসা হচ্ছে সাহিত্যের দোকানপাট তুলে দেওয়া। এই আসন্ন বিপদের দিনে আমরা লিখতে পারি, কিন্তু সে লেখা পড়বে কে? কিন্তু দোয়াত কলমের সংস্রব না হয় আমরা ত্যাগ করলুম, তাই বলে কি দেশশুদ্ধ লোকের পক্ষে পুঁথির

সংস্পর্শ ত্যাগ করা সঙ্গত হবে? ঝড় বলো, ভূমিকম্প বলো, বন্যা বলো, এ সব ব্যাপার অতি ভীষণ হলেও ক্ষণস্থায়ী, আর সাহিত্য অতি সুকুমার হলেও চিরস্থায়ী। সুতরাং দুর্দ্দিনেও তা অপরিহার্য্য। তবে সুদিনের সাহিত্য ও দুর্দ্দিনের সাহিত্য অবশ্য এক নয়।

গেটে বলেন, দেশে যখন মহামারি উপস্থিত হয় তখন লোকের পড়া উচিত টনিক সাহিত্য। এ উপদেশ যখন গেটের তখন, আমাদের সকলকে তা মাথা পেতে নিতে হবে। তবে সাহিত্য সম্বন্ধে "টনিক" বিশেষণের সার্থকতা কি তা আন্দাজ করতে পারলেও দুকথায় বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। তবে কোন্ সাহিত্য যে টনিক নয়, সে কথা বলা তেমন শক্ত নয়।

প্রথমত আমাদের চল্‌তি সাহিত্যের কথা ধরা যাক্। যে সাহিত্যের দিনে দুবার জন্ম হয়, সংবাদ পত্রের স্তম্ভে আর বক্তৃতার মঞ্চে, আর যার নাম পলিটিকাল সাহিত্য, তা অবশ্য মোটেই টনিক নয়। সে সাহিত্যের যে রস, তা আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে রস মিশ্র এবং লোকে বলে তা বিলেতি। করুণ রসের "সোডার" সঙ্গে বীররসের "আসিড" মিশিয়ে তা তৈরি করতে হয়। তাই পলিটিকাল সাহিত্য প্রথমত আপাদমস্তক ফেনিল, তার পর সে সাহিত্য উথলে ওঠে অথচ তার ভিতর তাপ নেই, ফোঁস ফোঁস করে অথচ তার ভিতর প্রাণ নেই। সে সাহিত্য যে এতটা লোকপ্রিয় তার কারণ, ও ফেন গলাধঃকরণ করবার সময়, ভোক্তার ভিতরটা ক্ষণিকের জন্য চিন্‌চিন্ করে' ওঠে, আর সে মনে করে জিনিসটা ভয়ঙ্কর অগ্নিবর্দ্ধক। বলা বাহুল্য ও ধারণা একটা ভ্রান্তি মাত্র। অথচ আমাদের রাজনীতি, দেশের মনের অগ্নিমান্দ্যের অন্য

কোনও টনিক অদ্যাবধি তৈরি করতে পারে নি। ও সাহিত্যের যা কিছু হেরফের সে শুধু ঐ দুই বস্তুর মাত্রা নিয়ে। আমাদের পলিটিক্‌সের যে দুদল হয়েছে তার কারণ এদের এক দলের সাহিত্যে সোডার ভাগ বেশী, আর এক দলের সাহিত্যে আসিডের।

আজকের দিনে এ সাহিত্য যে রূপধারণ করেছে তাতে মানুষকে চাঙ্গা করা দূরে থাক, দ্বিগুণ দমিয়ে দেয়। এই রক্ত-সন্ধ্যার করাল আলোকে আমাদের সকল অক্ষমতা, সকল দৈন্য, আরও বেশী করে ফুটে উঠছে। অমনি আমাদের পলিটিকাল সাহিত্য, আমাদের দুরবস্থার ছবি নৈরাশ্যের কালীতে এঁকে সকলের চোখের সুমুখে ধরে দিচ্ছে। আমাদের ইতিহাস যদি অন্যরূপ হত তাহলে আমরা যে অন্যরূপ হতে পারতুম, এই কথাটা নানাসুরে নানাছাঁদে বলা হচ্ছে,—কিন্তু আমরা অন্যরূপ হলে যে আমাদের ইতিহাস অন্যরূপ হতে পারত, এমন কি এখনও হতে পারে, এ কথাটা চাপা পড়ে যাচ্ছে। ইতিহাস যে মানুষ গড়ে তা আমরা সকলেই জানি,—কিন্তু আমাদের এটাও জানা উচিত যে মানুষেও ইতিহাস গড়ে। এ সত্য যদি আমরা উপেক্ষা না করতুম, তাহলে ইতিহাস আমাদের গড়্‌ত না, আমরা ইতিহাস গড়তুম। মানুষের জীবন কতক অংশে অদৃষ্ট ও কতক অংশে পুরুষকারের অধীন। যে সাহিত্য পুরুষকারের গুণ গায় তাই টনিক, আর যা অদৃষ্টের দোষ দেয় তাই আণ্টি-টনিক।

সুতরাং টনিক সাহিত্যের সন্ধানে আমাদের বর্ত্তমানের দৈনিক সাহিত্যের বাইরে যেতে হবে। এবং আমরা ভারতবর্ষের অতীতের যত দূরদেশে যাব, তত বেশী টনিক সাহিত্যের সাক্ষাৎ পাব।

বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় নেই, কিন্তু সে

সাহিত্যের যে দুটি একটি বাণী আমার কানে এসে পৌঁচেছে তার তুল্য টনিক কথা ভূভারতে আর নেই। গায়ত্রী মন্ত্রের মত, আত্মার বল-কারক মন্ত্র বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। ওর ভিতর কোনও রূপ ভিক্ষা, প্রার্থনা, দরবার, কিম্বা আবদারের নামমাত্র নেই। মানুষের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান বরেণ্য বস্তু যে আলোক, বাইরের এবং ভিতরের, এ সত্য যদি আমরা বিস্মৃত না হতুম তাহলে আমাদের এ দুর্দ্দশা হত না।

তার পর প্রাচীন যুগের আগাগোড়া সংস্কৃত সাহিত্য টনিক, তা সে ধর্ম্মশাস্ত্রই হোক্ আর মোক্ষশাস্ত্রই হোক্। গীতা যে, ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্যের প্রশ্রয় দেয় না—তা সকলেই জানেন। মনুও যে দেন না, তার পরিচয় মনুসংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখতে পাবেন। সেকালে যিনি বাণপ্রস্থ অবলম্বন করতেন তাঁর মহাপ্রস্থানের দুঃসাহিসকতার কথা কল্পনা করতেও আমাদের রোমাঞ্চ হয়। এমন কি, সংস্কৃত কামশাস্ত্রে যে কামের চর্চ্চার কথা আছে তা করতে পারে শুধু সেই লোক—যার হৃদয় পাষাণে আর দেহ ইস্পাতে গড়া। ও সাহিত্য অবশ্য টনিক নয়, একেবারে বিষবড়ি!

হয়ত অনেকে বলবেন, এ সব শাস্ত্র সাহিত্যই নয়। তথাস্তু। অতঃপর সাহিত্যেই আসা যাক্। মহাভারত যে টনিক এ বিষয়ে বোধহয় দ্বিমত নেই।

রামায়ণ অবশ্য মহাভারতের সমশ্রেণীর কাব্য নয়। এ কাব্য আর্য্য-সভ্যতার সঙ্গে অনার্য্য সভ্যতার সংঘর্ষের কাহিনী। এই সংঘর্ষে অবশ্য আর্য্যসভ্যতাই জয়ী হয়েছিল, কিন্তু এ কাব্যের অন্তরে উত্তরাপথের টনিক সভ্যতার সঙ্গে দক্ষিণাপথের অটনিক সভ্যতার স্পর্শের প্রথম

পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে এই সূত্রে sentimentalism প্রবেশ লাভ করে।

ইতিহাস ছেড়ে দিয়ে যথার্থ কাব্যের রাজ্যে এলেও আমরা ঐ একই সত্যের পরিচয় পাই যে—সংস্কৃত কাব্য যত প্রাচীন তত টনিক, এবং যত অর্ব্বাচীন তত অস্বাস্থ্যকর। ভাসের নাটকের সঙ্গে জয়দেবের পদাবলীর তুলনা করলে এ সত্য সকলের কাছেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিমধ্যের ইতিহাস এই অধঃপতনের ইতিহাস। যুগের পর যুগে তার দুর্ব্বলতা যে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, একই শ্রেণীর পূর্ব্বাপর কাব্যের তুলনা করলে তার প্রমাণ অসংখ্য পাওয়া যায়। শকুন্তলার রসের সঙ্গে উত্তররাম চরিতের রসের সেই প্রভেদ, হৃদয়ের রক্তের সঙ্গে চোখের জলের যে প্রভেদ। অমরুশতক মকরধ্বজ কি না জানি নে—কিন্তু ভর্তৃহরির শতকের প্রতি শ্লোক যে strychnine-এর পিল তাতে আর সন্দেহ নেই। এক কথায় মন্দাকিনীর জল টনিক, ভোগবতীর নয়। আর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীন কাব্যের সঙ্গে অর্ব্বাচীন কাব্যের সেই প্রভেদ, মন্দাকিনীর সঙ্গে ভোগবতীর যে প্রভেদ।

আমার কথা ভুল বুঝোনা। আমি এ কথা বলতে চাইনে যে, যে লেখা টনিক নয় তা সাহিত্য নয়। তাহলে ত বাংলা ভাষার বারো আনা লেখা সাহিত্যের বাইরে পড়ে যায়। আমার বক্তব্য এই যে, যে সাহিত্য টনিক নয়—মহামারীর প্রকোপের ভিতর তার পঠন পাঠন সমীচীন নয়; অবশ্য যদি গেটের মত আমরা মান্য করি।

আমি নিজে যে ও মত সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করি নে, তার প্রমাণ, যুদ্ধের নাম শোনবামাত্রই, প্রথম কথা যা আমার মনে পড়ে গেল, সে হচ্ছে

অহিংসা পরম ধর্ম্ম। এই যে মানব সভ্যতার শেষ কথা তা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি। এই বিরাট হত্যাকাণ্ডেও আমার এ বিশ্বাস টলাতে পারে নি, কেননা এ ব্যাপার এই সত্যেরই প্রমাণ দিচ্ছে যে, মানুষ আজও তার পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করে নি। নর সংস্কৃত-বানর কিম্বা বানর নরের অপভ্রংশ এ নিয়ে জীবতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে আজও তর্ক চল্‌ছে। তাত্ত্বিক ও তার্কিকদের কথা ছেড়ে দিলেও আমরা সাদা চোখে স্পষ্ট দেখতে পাই, মানুষেও মর্কটে আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত যথেষ্ট মিল আছে। মর্কটের ভিতর মনুষ্যত্ব আছে কি না জানি নে—কিন্তু মানুষের ভিতর যে মর্কটত্ব আছে তা অস্বীকার করবার জো নেই। মানুষে মানুষে যা প্রভেদ, সে হচ্ছে প্রধানত এই মনুষ্যত্ব ও মর্কটত্বের অনুপাত নিয়ে। "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এ হচ্ছে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বাণী, অতএব আমাদের অন্তর্নিহিত মর্কট সে বাণীকে অবজ্ঞা করে' উপহাস করে' বলে, ও হচ্ছে দুর্ব্বলের ধর্ম্ম।

এ অভিযোগ যে মিথ্যা তার প্রমাণ, যে যুগে ভারতবর্ষ এই ধর্ম্ম অঙ্গীকার করেছিল সেই হচ্ছে ভারতবর্ষের অপূর্ব্ব শক্তির যুগ। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে কলায়, সাম্রাজ্যে ও বাণিজ্যে ভারতবর্ষের বৌদ্ধযুগের কৃতিত্বের আর তুলনা নেই। তার কারণ, শুধু রণক্ষেত্রে নয়, জীবনের সকলক্ষেত্রে যারা বীর তারা ছাড়া আর কেউ ও ধর্ম্ম যথার্থ গ্রহণ ও পালন করতে পারে না। কেননা ও ধর্ম্ম অনুসরণ করবার ভিতর যে বীরত্ব, তা ক্ষণিকের নয় চিরজীবনের। সে বীর্য্যের অন্তরে অগাধ করুণা আর অটল ধৈর্য্য সমান থাকা চাই।

বৌদ্ধধর্ম্ম যে বীরের ধর্ম্ম, সে জ্ঞান আদি বৌদ্ধদের পূর্ণমাত্রায় ছিল সেইজন্যে তাঁদের কথা-সাহিত্যের নাম "অবদান" অর্থাৎ বীর কাহিনী।

এ সাহিত্য আমি পূর্ব্বে কখনও শ্রদ্ধাভরে পড়ি নি,—কেননা জাতকমালার সঙ্গে যৎসামান্য পরিচয় থেকে আমার মনে একটা ধারণা জন্মেছিল যে ও হচ্ছে ছোটছেলের সাহিত্য। কিন্তু সেই জাতকমালা সে দিন আবার পড়্‌তে গিয়ে তার ভিতর এক মহাবস্তুর সাক্ষাৎ লাভ করেছি, সে হচ্ছে মানুষের আত্মনির্ভরতার মহত্ব। বৌদ্ধযুগ যে শক্তির যুগ, তার কারণ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম মানুষকে তার আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে শিখিয়েছিল। শাক্যসিংহ যে, মানুষের হাতেগড়া মানুষের পায়ের বেড়ি ভেঙ্গে দিয়েছিলেন শুধু তাই নয়, তাদের হাতের কড়া ও খুলে দিয়েছিলেন—তাঁর ধর্ম্মপুত্রেরা দেবতার কাছেও হাতজোড় করতেন না। তাঁদের চিরনির্ভর স্থল ছিল, নিজের ধর্ম্মবল ও নিজের কর্ম্মবল। তুমি ভাব্‌ছ আমি আজ কি একটা খেয়ালের মাথায় বৌদ্ধদের আকাশে তুলে দিচ্ছি। এ সব যে আমার কল্পনা নয় তার প্রমাণ স্বরূপ তোমাকে সংক্ষেপে সুপারগ জাতকের গল্পটি বলছি।

পুরাকালে ভারতবর্ষে একটি মহাসত্ত্ব পরমনিপুণমতি নৌ-সারথি ছিলেন। তাঁর যাত্রাসিদ্ধির গুণে লোকসমাজে তিনি সুপারগ নামে প্রসিদ্ধ হন। কোনও এক সময়ে সুবর্ণভূমির বণিকগণ সাগরপারে যাবার সংকল্প করে সুপারগের দ্বারস্থ হন। বার্দ্ধক্যবশত তখন তাঁর দেহ জরাশিথিল হয়ে পড়েছিল, দৃষ্টিক্ষীণ হয়ে এসেছিল, স্মৃতিশক্তির হ্রাস হয়েছিল, বলে' প্রথমে তিনি মহাসমুদ্র যাত্রা করতে স্বীকৃত হন নি; নিজের জীবনের ভয়ে নয়, যাত্রীর বিপদ আশঙ্কা করে। বণিকগণের নির্বন্ধাতিশয্য অতিক্রম করতে না পেরে অবশেষে তিনি ভরুকচ্ছ হতে মহাসমুদ্র যাত্রা করলেন। দিনটা ভালয় ভালয় কেটে গেল, সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে উঠল প্রচণ্ড ঝড়। সে ঝড়ের বর্ণনা এত সুন্দর

যে তা অনুবাদ করবার লোভ সম্বরণ করা কঠিন কিন্তু এখন তার সময় নেই। সে বর্ণনা তুমি জাতকমালায় পড়ে দেখো। এই ঝড়ের মধ্যে সাংযাত্রিকেরা কে কি করলেন শোনো—

"নিজ নিজ সত্ত্বগুণ অনুসারে কেউ বা ত্রাসদীন হয়ে পড়্‌ল, কেউ বা বিষাদমুক, কেউ বা স্বদেবতার নিকট প্রাণ যাচ্ঞা করতে লাগল, কেউ বা ধীরভাবে অবস্থিতি করতে লাগল, কেউ বা প্রতিকারের চেষ্টায় ব্যাপৃত হল।"

তখন যারা ভয়বিষাদে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল সুপারগ তাদের সম্বোধন করে বল্‌লেন—

"যারা মহাসমুদ্রে অবতরণ করে তাদের কাছে এইরূপ ঔৎপাতিকক্ষোভ পরিক্লেশ মোটেই আশ্চর্য্যজনক ঘটনা নয়;—অতএব তোমরা বৃথা বিষাদকে আশ্রয় করো না। বিষাদ, বিপদের প্রতিকারবিধি নয়—সুতরাং দীনচেতা হওয়ায় কোনও লাভ নেই। যারা ধীর কেবলমাত্র তারাই কার্য্যউদ্ধারে দক্ষ, কেন না তারা কৃচ্ছসাধনের দ্বারা কৃচ্ছ অবস্থা হতে উদ্ধারলাভ করে। তোমরা সকলে বিষাদ দৈন্য পরিহার করে এ বিপদ হতে যাতে উদ্ধার পাওয়া যায় সেই সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করো। যে প্রাজ্ঞ তার ধৈর্য্যজলিত তেজ সর্ব্বার্থসিদ্ধি-লাভে অগ্রহস্ত।

ঝড় কিন্তু উত্তরোত্তর প্রচণ্ড হতে প্রচণ্ডতর হয়ে উঠল শেষে যখন সকলে প্রাণের আশা ত্যাগ করতে বাধ্য হল তখন সাংযাত্রিকেরা

"কেউ বা রোদন করতে লাগল, কেউ বা কখন বিলাপ, কখন চিৎকার করতে লাগল, কেউ বা ভয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে জড় পদার্থের মত অবস্থিতি করতে লাগল, কেউ বা ভয়কাতরচিত্তে ইন্দ্রকে প্রণাম করতে লাগল, কেউ বা আদিত্যকে কেউ বা বরুণকে কেউ বা বায়ুকে কেউ বা সমুদ্রকে। কেউ বা মন্ত্র জপ করতে প্রবৃত্ত হ'ল, অপর অনেকে বিচিত্র আকারে বিধিমত প্রকারে

দেবীকে প্রণাম করতে লাগল। কেউ বা সুপারগের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে আক্ষেপ করতে লাগল।"

এই ব্যাপার দেখে সুপারগ সাংযাত্রিকদের সম্বোধন করে বললেন "তোমরা মুহূর্ত্তের জন্য ধৈর্য্য ধরে থাকো উদ্ধারের একটী উপায়ের কথা আমার মনে হয়েছে।" এই বলে তিনি দক্ষিণ জানু নৌকাবক্ষে স্থাপন করে নৌকাকে প্রণাম করে এই শ্লোক উচ্চারণ করলেন—

"আমি আমার আত্মাকে যতই স্মরণ করছি, ততই আমার স্মরণ হচ্ছে যে যত দিন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে, আমি কখনও প্রাণীহিংসার চিন্তাও মনের মধ্যে স্থান দিই নি। এই সত্যবাক্যবলে ও আমার সেই পুণ্যের বলে এই নৌকা বড়বার মুখহতে প্রতিনিবৃত্ত হউক।

অমনি বায়ুর বেগ মন্দীভূত হল, নৌকা বড়বার মুখ হতে প্রতি-নিবৃত্ত হয়ে, মহাসমুদ্রের বক্ষে, নির্ম্মল আকাশে রাজহংসীর মত শোভা পেতে লাগল।

সাহিত্য এর চাইতে আর কত বেশী টনিক হতে পারে? এই যুদ্ধের ঝড় যদি ভারতবর্ষের ঘাড়ে এসে পড়ে, তাহলে ভারতবাসীদের অবস্থা যে ঐ সাংযাত্রিকদের মতই হবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। তবে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, আমাদের কপালে অমন সুপারগ মিলবে কি না? আজ এইখানেই শেষ করি। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

২৬শে এপ্রিল ১৯১৮

বীরবল।

দেশের কথা।

——:*:——

গত বৎসরের সর্ব্বপ্রধান রাজনৈতিক ঘটনা হচ্ছে, মণ্টেগু সাহেবের ভারতবর্ষে পদার্পণ। তাঁর আগমনে, আমাদের পলিটিকাল আত্মা যে কি রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে আমাদের শিক্ষিত সমাজের অতিমাত্র চঞ্চলতায় ও মুখরতায়। কিন্তু আজ যখন সোরগোল মাতামাতি অনেকটা কমে এসেছে, তখন একটু ধীরভাবে ভেবে দেখা যাক্ ব্যাপারটা হ'ল কি।

মণ্টেগু সাহেব এসেছিলেন বোধহয় আমাদের পলিটিকাল জ্ঞান এগজামিন করবার জন্যে। তিনি আমাদের কাছে থেকে তাঁর প্রশ্নের লিখিত জবাব আর মুখের জবাব, দুইই নিয়েছেন। শুনতে পাই vivaতে আমাদের অধিকাংশ নেতাই একদম ফেল করেছেন—কিন্তু লিখিত জবাবে সকলেই ফাষ্টক্লাস পাস করেছেন। Problem কষতে আমাদের তুল্য আর কে আছে?—তা সে জ্যামিতিরই হোক্ আর রাজনীতিরই হোক্। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে এ পরীক্ষার জবাবগুলি সব যদি একত্র করে ছাপানো যায়, তাহলে এমন একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হবে, যা পড়ে আমরা চিরজীবন হাসতে পারব; এক কথায় ও গ্রন্থ হবে নব-ভারতবর্ষের নবকথা সরিৎসাগর।

সে যাই হোক, মণ্টেগু সাহেবের আগমনের একটা মস্ত সুফল ফলেছে। আমরা আমাদের পলিটিকাল দাবীর আরজি প্রস্তুত করতে

বাধ্য হবার দরুণ, আমাদের নিতান্ত অস্পষ্ট পলিটিকাল মনোভাবকে স্পষ্ট করতে বাধ্য হয়েছি। এ একটি মহালাভ। আমরা আজ সকলেই জানি যে, আমাদের পলিটিক্সের নানা দলের কে কি চান্। এর ভিতর থেকে একটি খুব মোটা সত্য বেরিয়ে পড়েছে, সে হচ্ছে—স্বরাজ শব্দের অর্থ বাংলা একভাবে বোঝে, আর বাকি ভারতবর্ষ আর একভাবে বোঝে;—অবশ্য যদি ধরে নেওয়া যায় যে অন্য প্রদেশের পলিটিকাল নেতারা স্ব স্ব প্রদেশের যথার্থ মুখপাত্র। বাঙ্গালীর সঙ্গে বাকি ভারতবাসীদের এ বিষয়ে মনের অমিল এতটা বেশী যে, এ অমিলের মূল কোথায় তা একটু তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমাদের স্বরাজ হচ্ছে ইংরাজি self-governmentএর ভাষায় অনুবাদ, অতএব-home-rule এরও অনুবাদ—কেন না ও দুই একই বস্তু, তফাৎ যা তা ভাষায়। একটির ভাষা সাধু, আর একটির অসাধু। এ কথা শুনে অবশ্য ও দুই দলই প্রতিবাদ করে উঠবেন। তাঁরা বলবেন, ও দুই সমাসের আভিধানিক অর্থ এক হলেও, ব্যঞ্জনার প্রভেদ ঢের। কিন্তু এ দুই পক্ষের প্রতি নজর দিলেই দেখা যায় যে উভয়ের প্রভেদ, ব্যঞ্জনার নয়—ব্যক্তির। তথাপি স্বরাজ অর্থে যে ভারতবর্ষের নানাদেশে, নানাদলে, নানালোকে নানা বস্তু বোঝে, তার দ্বেদার দলিল মণ্টেগু সাহেবের সেরেস্তায় পাওয়া যাবে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, আমাদের প্রতি দলের পকেটে এক একটি নিজস্ব মনগড়া স্বরাজ আছে; অথবা সকলের মুখে ও পদ থাকলেও, কারও মনে ও পদার্থ নেই। বোধহয় এই কারণে শেষটা গত কংগ্রেসে সকল প্রদেশের সকল নেতা এক হয়ে কংগ্রেস-লীগের মুসাবিদা গ্রাহ্য করেছেন। এ কথা ত সবাই জানেন। কিন্তু এ কথা হয়ত সবাই জানেন না যে,

এ ব্যাপারে একমাত্র প্রতিবাদী হয়েছিল বাংলা। কংগ্রেসের গ্রীনরুমে যাঁদের প্রবেশাধিকার আছে তাঁরাই জানেন যে, সেখানে কোনও বাঙ্গালী, কংগ্রেস-লীগের দুহাতে গড়া স্বরাজ মাথা পেতে নিতে পারেন নি; কেননা তা গ্রাহ্য করে নেবার কোনও বৈধ কারণ নেই। স্বরাজের প্রথম আরজি বড়লাট সভার উনিশ জন দেশীসভ্য দস্তখত করে ভারত-গভর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করেন। সে আরজি অবশ্য একটা খসড়া বই আর কিছুই নয়, কেননা সে আরজি রাতারাতি তৈরি করতে হয়েছিল, সবদিক ভেবেচিন্তে একটা পাকা দলিল তৈরি করবার তাঁদের অবসর ছিল না; অন্ততঃ এই ত তাঁদের কৈফিয়ৎ। সেই খসড়াই একটু আধটু বদলসদল করে নিয়ে কংগ্রেস-লীগ আত্মসাৎ করেছেন। সুতরাং এ দুয়ের প্রভেদ যা, তা উনিশ বিশ। অথচ কংগ্রেস এই জিনিসই শিরোধার্য্য করে নিলেন,; শুধু তাই নয়, আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে এমনটি আর হয় নি, হবে না, হতে পারে না।

এই সূত্রে শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক রাজনৈতিক দর্শনের একটি নূতন তত্ত্ব আমাদের শিক্ষা দেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি কংগ্রেসের উচ্চমঞ্চে দাঁড়িয়ে ঝাড়া একঘণ্টা ধরে আমাদের মনে এই কথা বসিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন যে,—মানুষে যখন তার বাসগৃহ তৈরি করে, তখন সে গৃহ ভিৎ থেকে গেঁথে তুলতে হয়; কিন্তু কোনও জাতি যখন তার বাসগৃহ তৈরি করতে চায়, তখন সে গৃহ ছাদ থেকে গেঁথে নামাতে হয়। আমাদের পলিটিকাল আশা গোড়াতে অত উচ্চ না হলেও ক্ষতি নেই। অপর কোনও ক্ষেত্রে অপর কোনও ব্যক্তি এ রকম কথা বল্‌লে আমরা তা রসিকতা মনে করতে পারতুম। কিন্তু এ রসিকতা নয়—এ হচ্ছে সেকেলে পলিটিক্‌সের একটা মোটা কথা;

এর অর্থ হচ্ছে শাসনতন্ত্র জাতির পক্ষে নিজে গড়ে তোলবার জিনিস নয়, কিন্তু উপর থেকে তার মাথায় চাপিয়ে দেবার জিনিস।

রাজনীতির এ আদর্শ বাঙ্গালী গ্রাহ্য করতে পারে না কেননা না তা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বাঙ্গালীর কাছে ন্যাসনালিজমের অর্থ হচ্ছে জাতির স্বধর্ম্মের চর্চ্চা, এবং সেই শাসনতন্ত্রই ঈপ্সিত ও বরণীয়, যার অন্তরে একটি বিশেষ জাতির স্বধর্ম্ম পূর্ণবিকশিত হয়ে ওঠবার পূর্ণ অবসর পায়। অতএব প্রতি দেশের স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যই তার ন্যাসনালিজমের অটল ভিত্তি। দেশের মত বলে কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নেই, কিন্তু জাতির মতি বলে একটি জিনিস আছে। এক একটা জাতির মনের এক একটা বিশেষ গতি আছে; এবং সে গতির এক একটা বিশেষ লক্ষ্য আছে। বাঙ্গালী জাতির মতির পরিচয়, রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাংলার যত মহাপুরুষদের কথায় ও কাজে পাওয়া যাবে। স্বাধীনতা শব্দের অর্থ আমাদের কাছে কেবলমাত্র রাজনীতিগত নয়—কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশী উদার, ঢের বেশী ব্যাপক। আমরা জীবনে ও মনে সমান মুক্তির প্রয়াসী। তাই আমাদের রাজনীতি আমাদের জীবনবেদের বহির্ভূত নয়, অন্তর্ভূত,—এবং একাংশ মাত্র। বাঙ্গালীদের কাছে একটা বিশেষরকম শাসনতন্ত্র জাতীয় জীবনের কৃতার্থতার লক্ষ্য নয়, উপায় মাত্র। কিন্তু কংগ্রেস ও লীগ আপোষ মীমাংসা করে, জোড়াতাড়া দিয়ে, যে স্বরাজের আদর্শ খাড়া করলেন, তাতে প্রতি প্রদেশের প্রতি জাতির স্ব-বস্তুটি চাপা পড়ে গেল।

এতে পলিটিকাল বুদ্ধিরই যে কি পরিচয় দেওয়া হল, তাও বোঝা কঠিন। এ সত্যও কি সুস্পষ্ট নয় যে, গোটা ভারতবর্ষের যুক্ত-স্বরাজ্য প্রতি প্রদেশের স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যের উপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত

হবে, এবং অন্য কোনও উপায়ে হবে না। অথচ বাংলার সকল নেতাই ঐ অদ্ভুত রায়ে সায় দিলেন ও সই দিলেন। এর পরেও লোকে বলে বাঙ্গালীর discipline-এর জ্ঞান নেই। বাঙ্গালী নেতারা অপর প্রদেশের নেতাদের দ্বারা যত সহজে নীত হন, এমন আর কেউ হয় না। বাঙ্গালীর আশার কথা এই যে, তারা জাতি হিসাবে সহজে কারও দ্বারা নীত হয় না।

আমার বিশ্বাস আমার এ কথায় সকল বাঙ্গালীই সায় দেবেন যে, আমাদের ঘর আমরা নিজহাতে নীচে থেকেই গেঁথে তুলতে চাই, উপর থেকে গেঁথে নামাতে চাই নে। আশা করি, আমাদের নেতারা এই সত্য মনে রাখবেন যে, যেখানে গোড়ায় মিল নেই, সেখানে গোঁজা মিলন দিয়ে কোনও লাভ নেই, শেষটা ভুগতেই হবে। নিজের ideal ভ্রষ্ট হলেই মানুষের সকল কার্য্য নষ্ট হয়, কেননা ideal-এর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ তার আত্মশক্তি হারায়।

(২)

আমি আগে এক সময় বলেছি যে, আমাদের স্বরাজ লাভের কথা শুধু ঘরের কথা নয়—বাইরেরও কথা, এবং তা যতটা না ঘরের কথা তার চাইতে ঢের বেশী বাইরের কথা। দেখা যাক্ এ কথাটা সত্য কি না।

যে স্বরাজ লাভের জন্য শিক্ষিত ভারতবাসী আজ লালায়িত সে স্বরাজ যে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ও অঙ্গীভূত হবে—এ কথা ত সর্ব্ববাদীসম্মত। এ ছাড়া অপর কোনরূপ স্বরাজের আমরা কল্পনাও

করতে পারি নে ; যদি কেউ পারেন, তাহলে তাঁর কল্পনাশক্তি কোনরূপ জ্ঞানের দ্বারা সংযত বা বুদ্ধির দ্বারা নিয়মিত নয়। যাঁর কাছে স্বরাজ্য ও স্বপ্নরাজ্য একই বস্তু তাঁর সঙ্গে বাক্যব্যয় করা বৃথা। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, আমাদের ভবিষ্যৎ ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যতের উপরেই নির্ভর করবে, এবং সে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলাফলের উপরেই নির্ভর করছে। এক কথায়, পৃথিবী জুড়ে যে মহানাটকের অভিনয় হচ্ছে—আমরা এই তিন চার বছর ধরে তারই একটি ক্ষুদ্র গর্ভাঙ্ক অভিনয় করে আসছি, এবং সেই নাটকের যবনিকা না পড়া পর্য্যন্ত আমাদের অভিনয়ের সার্থকতা আমরা টের পাব না।

এই মহানাটকের শেষাঙ্ক এই দেশে অভিনীত হবারও শুনছি একটা সম্ভাবনা ঘটেছে। সুতরাং এ যুদ্ধের ভিতরকার কথাটা আবার তোলা যাক্।

গত চল্লিশ বৎসরের জর্ম্মাণ মতিগতির সঙ্গে যাঁর কিছুমাত্র পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, বিশ্বমানবের উপর প্রভুত্ব লাভ করাই হচ্ছে Imperial Germany-র রাজনীতির উদ্দেশ্য, এবং তার রণনীতি হচ্ছে সেই উদ্দেশ্যসাধনের উপায়। বর্ত্তমান জর্ম্মাণ দর্শন এই রাজনীতির উত্তরসাধক, এবং জর্ম্মাণ বিজ্ঞান এই রণনীতির ক্রীতদাস। এক কথায়, এ যুদ্ধ সকল জাতির ন্যাসনলিজিমের বিরুদ্ধে জর্ম্মাণ ইম্পিরিয়ালিজমের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে যদি জর্ম্মাণী জয়লাভ করে, তাহলে পৃথিবী হতে ন্যাসনলজিমের নাম পর্য্যন্ত লোপ পাবে, এবং যে স্বরাজের দিকে আমরা দেশসুদ্ধ লোক হাত বাড়িয়েছি, এবং যা আশু আমাদের হাতে আসবার সম্ভাবনা আছে তা গন্ধর্ব্বপুরীর মত এক নিমেষে শূন্যে মিলিয়ে যাবে। এ কথা আমি আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি

বলে,—আমার মতে আমাদের সকলকে সকলরকম দ্বিধা সঙ্কোচ ত্যাগ করে স্বদেশরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। একমাত্র কামনার বলে স্বরাজ লাভ করা যায় না,—তার পিছনে থাকা চাই জাতির মহৎ কর্ম্মফল। আমাদের শাস্ত্রে বলে, স্বর্গরাজ্যের ভোগের মেয়াদ—মানুষের পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যের উপর নির্ভর করে। স্বরাজলাভ আর স্বদেশরক্ষা যে একই বস্তুর এ পিঠ ও পিঠ, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন; তবে তার কোনটি সদর আর কোনটি মফঃস্বল, এই নিয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছি মতভেদ আছে। এর কোনটি আগে কোনটি পরে, এই নিয়ে আমাদের পলিটিকাল দলে এমন একটা তর্ক বেধেছে, যার ফলে ভ্রাতৃবিরোধ, বন্ধু-বিচ্ছেদ, গুরুশিষ্যে মনান্তর প্রভৃতি ঘটবার উপক্রম হয়েছে। বীজ আগে না বৃক্ষ আগে, তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল, এ সব ন্যায়ের তর্কে যে বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয় না, এমন কথা আমি বলি নে। ওরও সময় আছে, কিন্তু আজকের দিন সে সময় নয়। কাল হয়ত আমাদের জাতীয় শক্তির পরিচয় দিতে হবে, এবং সে পরীক্ষার জন্য আজ আমাদের, অন্ততঃ মনে প্রস্তুত হওয়া উচিত।

১লা মে ১৯১৮।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।